২ এপ্রেল ১৯৮৬ ☐ আনন্দবাজার প্রকাশন ☐ তিন টাকা

আনন্দমেলা

Hard Copy & Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ফ্যারেক্স® প্রথম পছন্দের!

কারণ, নতুন উন্নত ফ্যারেক্স-এ, বাচ্চাকে তার প্রথম ধাপের শক্ত-আহার ধরানোয় সাহায্য করার জন্যে থাকে, অত্যাবশ্যক সব উপাদানের সঠিক সম্মেলন।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ

ফ্যারেক্স, প্রোটিনে ভরপুর হয়. যা বাচ্চাকে দৃঢ় ও সুস্থভাবে বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফ্যারেক্স-এ থাকে, বাচ্চার কোমল হজম-ক্রিয়ার উপযুক্ত, বিশেষভাবে ফর্মূলেট করা একেবারে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট।

বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে থাকে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন

বাচ্চার ৪ মাসের সময়, তার মজুত রাখা সমস্ত আয়রন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে যা, বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত

বিশেষভাবে ফর্মূলেট করা ফ্যারেক্স-এ থাকে, ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২ঃ১ আদর্শ অনুপাত যা, দিনের পর দিন ধরে, বাচ্চার দাঁত ও হাড়, শক্ত ও সুস্থভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আর, পুষ্টিকর এই ফ্যারেক্স-এর প্রতিটি আহার এখন আরো বেশী সুস্বাদু করা হয়েছে — আর, এটি মেশানোও অতি সহজ।

সস্নেহ উপহার এনেছে গ্ল্যাক্সো!

নতুন উন্নত **ফ্যারেক্স**®

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই!
এ শুধু জল দিয়ে মেশান, আর খাওয়ান।

CLARION/B/GX/10/244 BEN

আনন্দমেলা

১৯ চৈত্র ১৩৯২ □ ২ এপ্রিল ১৯৮৬ □ ১১ বর্ষ

সম্পূর্ণ উপন্যাস
চলো, হারিয়ে যাই । রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫
বড়গল্প
পণ্ড পিকনিকের উৎসে। রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ১৫
গল্প
দোসরা এপ্রিলের বিস্ফোরণ । অচিন্ত্য বিশ্বাস ১৩
অরবিন্দর পিসিমা । রানা চট্টোপাধ্যায় ২৯
হাতে-কলমে । অনিরুদ্ধ কর ৪৭
ভ্রমণকাহিনী
জাপানি আতিথ্যে একরাত্তির । দেবযানী রায় ৯
ধারাবাহিক উপন্যাস
ডোরাকাটা জামা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৫
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫১
শার্লক হোমসের গল্প
হলদে মুখ । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫
ছড়া ও কবিতা
আচ্ছা খেলা খেলতে গেলুম । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮
জ্যোৎস্না রাতের মানে । মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ২৭
বিজ্ঞানবিচিত্রা
পিকিং-মানুষ । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৪৬
লেখাপড়া
দীর্ণ…কুলিশ…(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭
একটা দরকারি কথা (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন । শ্যামলকান্তি দাশ ৩২
খেলাধুলো
হকি-সিরিজ ভারত জিতল । সুজয় সোম ৬২
হ্যাডলির কীর্তি । সুব্রত সিংহ ৬৩
কলকাতায় আন্তর্জাতিক দাবা-টুর্নামেন্ট । মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ৬৪
আন্তর্জাতিক রেফারি-বর্ষ । রত্না শূর ৬৫
ক্রিকেটারদের গল্প । সম্রাট রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ডাক্তারবাবু বলছেন । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৪৬
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

খুচরা বিক্রেতাবন্ধুদের জন্য সুখবর

কোহিনূর সামার স্পেশাল '৮৬

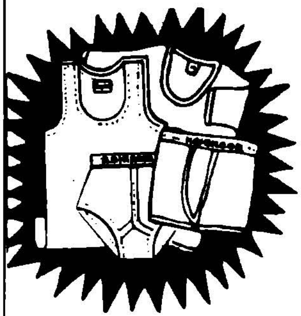

* চার্লি ইন্টারলক ড্রয়ার ও ব্রিফ
* সামার কুল রঙিন গেঞ্জি
* লেডিজ প্যান্টি

বিক্রির ওপর

বিনামূল্যে উপহার

আপনাদের যা করতে হবে :

ওপরের রকমারি জিনিসগুলি কেনার সময় আপনার ডিলারের কাছ থেকে অর্ধেক বা পুরা কুপন সংগ্রহ করুন এবং নিম্নোক্তমতো চমৎকার উপহার সংগ্রহ করুন :

১) এক ডজন ড্রয়ার কালার রিব (যেকোন সাইজ)
এক ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
— ৬০টি পুরা বা ১২০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

২) ১½ ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
" " " বি এল এফ আর এন (")
" " নিউ মেট্রো এফ আর এন (")
" " ৬৬৬ বি এল আর এন (")
— ১২০টি পুরা বা ২৪০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

৩ ডজন মেট্রো কালার এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
৩ ডজন মেট্রো বি এল এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
১½ ডজন নিউ মেট্রো এফ আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
১½ ডজন ওয়াই ফ্রন্ট বি এল (যেকোন সাইজ)
১½ ডজন শ্রীমান এম ই আর সি ডি এল আর এন (সাইজ ৩০×৩৪)
— ১৮০টি পুরা বা ৩৬০টি অর্ধেক কুপনে বিনামূল্যে

মনে রাখবেন শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, ১৯৮৬

এ সুযোগ হারাবেন না

আমাদের খুচরা বিক্রেতাবন্ধুবর্গকে অনুরোধ মালপত্র বিলম্বে সরবরাহের জন্য বা অন্য কোন কারণে অসুবিধার মুখোমুখি হলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :

কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ৩৩৩৩১২—৩৩০৪৩৪

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক !

বোর্নভিটা — মল্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, যাতে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবেরি— ১০০ বছরেরও ওপর যারা পানীয় আহার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ।

প্রতি কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নভিটা মিশিয়ে খেলে, পরিবারের প্রত্যেকে পাবে পুষ্টি ও আস্বাদে ভরা এক পানীয়। বোর্নভিটা বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে ওদের দিনে দুবার বোর্নভিটা দিন— আর লক্ষ্য করুন, শরীর বৃদ্ধির উপযোগী যথাযথ শক্তি পেয়ে ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ছে !

বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীলা এক মা বলেনঃ "আমার বাচ্চাদের দুধে বোর্নভিটা মিশিয়ে খাওয়াই বলে, ওরা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর শক্তি যথাযথভাবে পায় —তাইতো পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হবেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ম.
যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

OBM/5135/BEN

পিকিং-মানুষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আরব্য উপন্যাসে এক রকমের টুপির কথা জানা যায়। তাকে বলে গায়েবি-টুপি। সে-টুপি পরলে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না, তুমি কিন্তু সবাইকে দেখতে পাবে। মনে করো, এই রকমের এক গায়েবি-টুপি পরে আজ থেকে কম-বেশি ছ'লক্ষ বছর আগে তুমি হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছ চিনদেশের এক পাহাড়তলিতে।

তুমি দেখতে পাচ্ছ :

দুটো পা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে, শরীরটাকে একটু সামনে হেলিয়ে একদল শিকারি প্রাণী দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের হাতে ঠুকে-ঠুকে বাগিয়ে ধরার মতো করে নেওয়া আর ঘষে-ঘষে ধারালো করা পাথরের অস্ত্র। কারও কারও হাতে জুতসই মোটা লাঠি। অস্ত্র দিয়ে তারা নির্বিচারে জন্তু-জানোয়ার মারছে। কেউ বা ছুঁচলো ছড়ি দিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে কন্দ বার করছে। মাথায় কম-বেশি পাঁচ ফুট লম্বা। কী বিতিকিচ্ছিরি মর্কটের মতন দেখতে। দেখে তোমার মানুষ বলেই মনে হচ্ছে না।

বিশ্বাস করো, এরা কিন্তু বানর নয়, বনমানুষ নয়—সত্যিকারেরই মানুষ। অনেক মান্ধাতা আমলের পুরনো বলেই মানুষ বলে আজ তাদের চেনা শক্ত।

আদ্যিকালের এই মানুষদের বলা হয় পিকিং-মানুষ। আগে এদের বলা হত সিনানথ্রোপাস।

এদের যেসব হাড়গোড় আর মাথার খুলি পাওয়া গেছে, সেসব জোড়া লাগিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এদের আকৃতি-প্রকৃতির অনেকখানি আন্দাজ করে নিতে পেরেছেন।

দেখতে যাই হোক, ঘটে এদের বুদ্ধি ছিল খুব। অভ্যেসমতো খাবার না পেলে, সে জায়গায় চেষ্টা করে তারা নতুন ধরনের খাদ্য খুঁজে বার করত। দরকার পড়লে হয়তো একে অন্যকে মেরে খেতেও তাদের বাধত না। সেই হিসেবে তাদের নরখাদক বলেও সন্দেহ করা হয়। গুহার মধ্যে বিস্তর মাথার খুলি পাওয়া গেছে। যা থেকে বোঝা যায়, হয় এসব ছিল তাদের কাছে কৃতিত্বের পরিচয়, নয় ছিল ব্যবহার করার পাত্র।

এদের মাথার খুলিতে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যাতে বোঝা যায় যে, এরা কথা বলতে পারত। ঠেকায় পড়ে যেটুকু না জানালেই নয়, সেই রকমের সাদামাটা আধো-আধো কথা।

আগুনের ব্যবহারও তারা জানত।

উপরে বাঁয়ে অস্ট্রালোপিথিকাস মানুষের খুলি, আর ডাইনের খুলিটি একটি শিম্পাঞ্জির কোথায় সাদৃশ্য আর কোথায় বৈসাদৃশ্য, দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। একইসঙ্গে লক্ষ করো একেবারে নীচের খুলিটি। এই হল পিকিং-মানুষের খুলি নরকরোটির বিভিন্ন অংশ জুড়ে এটি তৈরি করা হয়েছে।

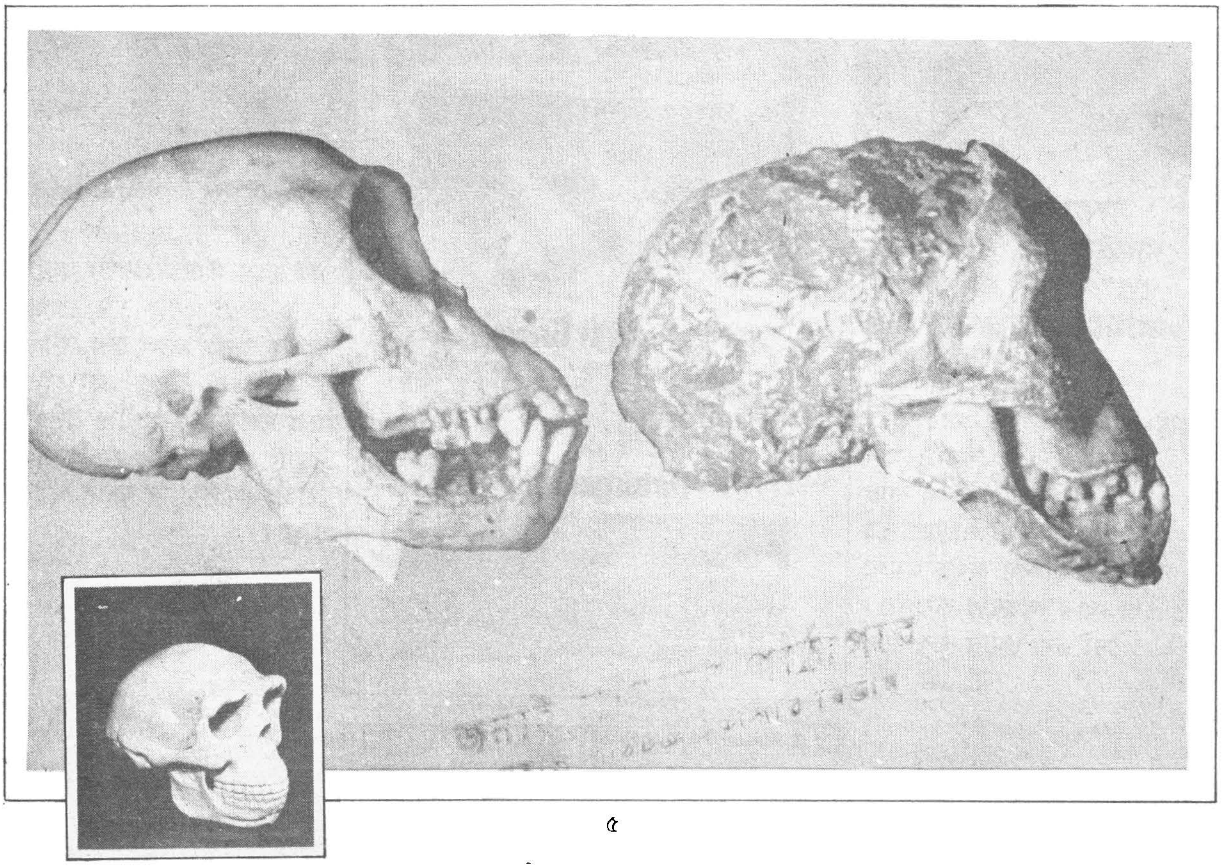

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি—

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

অর্থ জানো

দীর্ণ… কুলিশ….

বেশির ভাগ জিনিসই ব্যবহার না করার ফলে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। 'মরিচাতে যত ক্ষয়, ব্যবহারে তত নয়'। শব্দের বেলাতেও ওই কথা খাটে। অর্থ জানি না বলে কত শব্দ আমরা ব্যবহার করি না, ফলে সাহিত্য থেকে তারা চিরবিদায় নেয়। নীচের শব্দগুলির প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **দীর্ণ**— (ক) খণ্ডিত করা, (খ) বিনাশ করা, (গ) বিদারণ করা, (ঘ) চূর্ণ করা।

২। **দীপালি**— (ক) প্রদীপের আলো, (খ) প্রদীপ, (গ) মেয়েদের নাম, (ঘ) প্রদীপসমূহ।

৩। **উদ্দাম**— (ক) উন্মাদ, (খ) উলঙ্গ, (গ) বন্ধনহীন, (ঘ) বেপরোয়া।

৪। **ডঙ্কা**— (ক) ভেরী, (খ) ঢেঁটরা, (গ) মৃদঙ্গ, (ঘ) পেটা ঘণ্টা।

৫। **কুলিশ**— (ক) বৃষ্টির ফোঁটা, (খ) বজ্র, (গ) বিদ্যুৎ, (ঘ) বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিল।

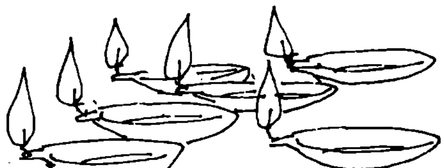

উত্তর : ১। **দীর্ণ**— (গ) বিদারণ করা। যেমন, 'রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা' (রবীন্দ্রনাথ)।

২। **দীপালি**— (ঘ) প্রদীপসমূহ। সংস্কৃত আবলি শব্দের অর্থ সমূহ, যেমন গ্রন্থাবলি। তা থেকেই আলি এখানে এসেছে। এর অন্য অর্থ দীপান্বিতা অমাবস্যা বা দেওয়ালি। যেমন, 'শেষের দীপালি রাত্রে, হে অশেষ' (রবীন্দ্রনাথ)।

৩। **উদ্দাম**— (গ) বন্ধনহীন। সংস্কৃত দাম শব্দটির একটি অর্থ বন্ধন। উদ্‌গত দাম বা দামমুক্ত। এই থেকেই বাংলায় শব্দটি উন্মত্ত, প্রগল্‌ভ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'তবু উদ্দাম, মৃত্যু আহত ফেলিনি দীর্ঘশ্বাস' (সুকান্ত ভট্টাচার্য)।

৪। **ডঙ্কা**— (খ) ঢেঁটরা। মূলে সম্ভবত রয়েছে সংস্কৃত শব্দ ঢক্কা। যেমন, 'রসনায় কালী কালী বলে, ডঙ্কা মেরে যাব চলে' (রামপ্রসাদ)।

৫। **কুলিশ**— (খ) বজ্র। মূল অর্থ যা পর্বতসকলের পক্ষ বিদারণ করেছে। এক সময়ে পর্বতদের পাখা ছিল, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তা ধ্বংস হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বন্দুকধারী পুলিশকে ঠাট্টা করে লিখেছেন, 'কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।'

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

একটা দরকারি কথা

মাঝে-মাঝে একটু দরকারি কথা বলে নিতে হয়। এবারও একটু বলি। এর আগের বার তোমরা এই তিনটে বাক্য পেয়েছ :

Where do you come from?
What did you do that for?
Who did you come with?
Who does she belong to?

বাক্য গঠনের নিয়ম মেনে ঠিকমতো বলতে গেলে বাক্যগুলো হওয়া উচিত ছিল :

From where do you come?
For what did you do that?
With whom did you come?
To whom does she belong?

কিন্তু এভাবে বাক্যগুলো কেউ বলে না, কিংবা আজকাল আর লেখেও না, খুব সম্ভবত প্রত্যেকটি বাক্যে যে শব্দটি সবচাইতে জরুরি সেইটাকে আগে আনবার জন্যেই ওই রকমভাবে বলা হয়। শব্দগুলি হল :

where, what, who

তারপর আবার, এসব ক্ষেত্রে, ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'হুম' কেউ বলে না, বলে 'হু'। অনেকের মতে 'হুম' কথাটারই নাকি ইংরেজি থেকে উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে।

একটা কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। অত্যন্ত প্রবলভাবে জীবন্ত একটা ভাষা, যেমন ইংরেজি, ব্যাকরণের খুঁটি-নাটি নিয়মকানুন সব সময় অত গ্রাহ্য করে না, যাদের যেটা মাতৃভাষা, তারা নিজেদের সুবিধের জন্যে নিজেদের ভাষার নিয়মকানুন বদলে বদলে নিয়ে থাকে। হয়তো শুনতে ভাল লাগবে বলে, কিংবা হয়তো কথাটাকে সহজ করবার জন্যে, বদলে নেয়।

যেমন, বলা উচিত ছিল :

Everybody came with his or her brother.

কিন্তু বলে :

Everybody came with their brothers.

কিংবা ধরো,

Who's that?

এর জবাবে কেউ বলে না, ইট্‌স আই। বলে :

It's me.

এরকম আরও অনেক আছে। ক্রমে-ক্রমে জানতে পারবে।

প্রসাদ

আচ্ছা খেলা খেলতে গেলুম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচ্ছা খেলা খেলতে গেলুম চৌমুহনার মোড়ে,
তেড়্‌ঢেঙে এক লোক সে আমায় ফেললে ছুটে ধরে।
বাও-ছেঁড়া তার ছপ্‌টি শিসোয়, বলছে, আমার সাথে
খেলবি তো খেল, 'না' করলে নেই ছাড়ানছুড়িন রাতেও,
বলেই সে বেত ঝিলকে তোলে, আওয়াজ যেন অবশ
আকাশ-ছেঁড়া রঙবেরঙে টস্‌টস্‌....

চু-কপাটি চেকনপাটি অ্যাড়নব্যাড়ন ধাঁধা,
ফাঁসরঙে মুখ জ্বলছে, দোহাই, দাও না যেতে দাদা,
দাও না গো যাই, দাও না, বলেই ফাঁক গলে যাই দে-ছুট,
দম নিতে যেই চাই ও যে সেও আসছে সমান পেছু,
চাবুক! ঘোড়া, চাবুক! হাতের ছপ্‌টি ঘুরোয়, ছাপুঙ!
মিছরি কুঁড়োয় মুখ ভরে যায় ঘুমঘুম....

মউ ভন্‌ভন্‌ ধান্‌তা ভানন জোড় পাখি আন, পাড়ি,
হ্যাংলা হাতে মুড়িয়ে নিল কঞ্চি পাতার কাঁড়ি,
থাবড়া দিয়ে চেচায়, ছুঁলুম! চোর দে এবার, ছোঁ আয়,
বলেই দেখি এক মিনিটে মিশিয়ে গেছে ধোঁয়ায়।
নেই তো! খালি ভাসছে শুনি ছড়ার গুজুরগুজুর,
গাছের পাতা সাঁঝের পাতা ঝুরঝুর....

ছবি : অনুপ রায়

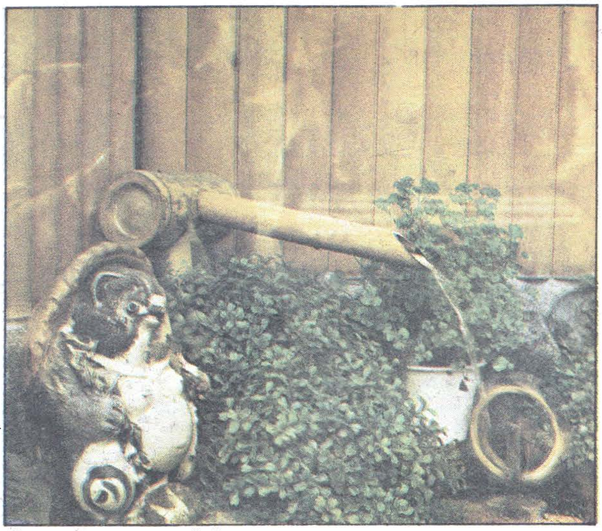

কিয়োটোর দোকানে মিনি-বাগান

সেইসঙ্গে দোকানে আছে আলোর জলুস

জাপানি আতিথ্যে একরাত্তির

দেবযানী রায়

'ক্যাথে প্যাসিফিকে'র জাম্বো জেট প্লেনটা যখন ওসাকা এয়ারপোর্টে নামার জন্যে তোড়জোড় শুরু করেছে, জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়ে ভাবছি, সত্যিই তা হলে জাপান পৌঁছলাম ! ছেলেবেলা থেকে জাপানের সম্বন্ধে কত কী পড়েছি, অ্যাটম বোমায় ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া হিরোসিমা-নাগাসাকি এই দেশেই—পরে বড় হয়ে পড়েছি রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রীর ডায়রি'—সেই জাপানেরই দ্বিতীয় বড় শহর ওসাকাতে আমাদের প্লেন যখন নামল তখন স্থানীয় সময় রাত আটটা ।

মালপত্তর নিয়ে পাশপোর্টে ছাপটাপ সমেত বাইরে বেরোতে একঘণ্টামতো সময় লাগল । আমরা যাব কোবে-তে, এক আত্মীয়ের বাড়ি । খোঁজ নিয়ে জানা গেল সামনেই কোবে যাবার বাস ছাড়ে । পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বেরোলাম বাইরে । প্লেন এবং এয়ারপোর্টের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বদ্ধতা থেকে বাইরে

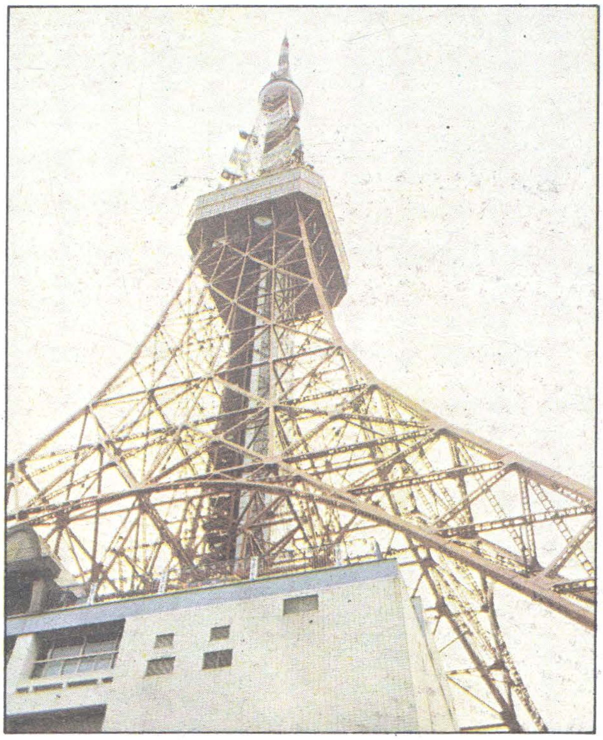

কিয়োটো শহরের টেলিভিশন টাওয়ার

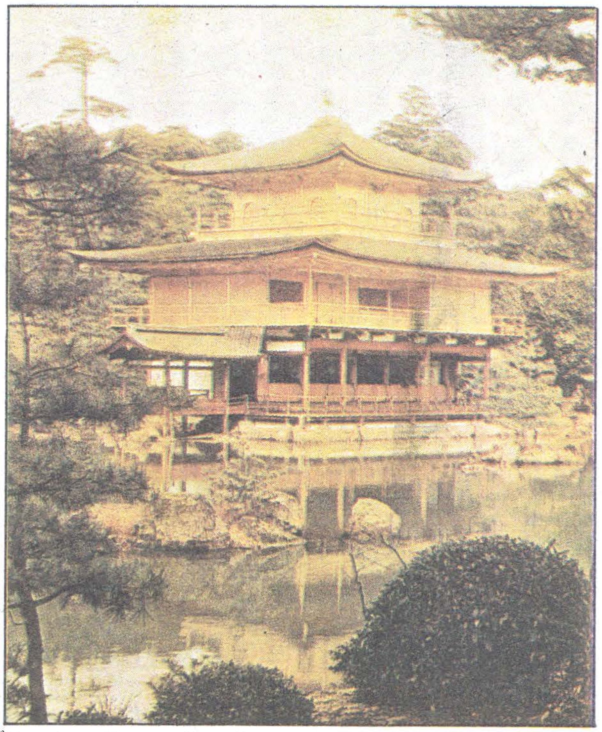

কিয়োটোর কিনেকাকুজি মন্দির

বেরিয়ে এসে মনে হল—বেশ ঠাণ্ডা। চোখের সামনে বিশাল বড় ন্যাশনাল প্যানাসনিকের বিজ্ঞাপন—জ্বলছে-নিবছে। কিছু দূর এগিয়েই বাস-স্টপ পাওয়া গেল। জাপানি ভাষায় ওপর-নীচ লম্বালম্বি অনেক কিছু লেখা—শুধু সময়টা লেখা ইংরিজিতে। আন্দাজে বোঝা গেল একটা বাস ছেড়ে গেছে ন'টায়, পরেরটা আসবে সোয়া ন'টায় এবং সেটাই শেষ বাস। ভাগ্যিস ! এটাও মিস করলে একগাদা পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি নিতে হত। ৯টা বেজে ১৪ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে বাস এসে দাঁড়াল—হুশ্ করে খুলে গেল অটোমেটিক দরজা। দারুণ সুন্দর পর্দা-টর্দা লাগানো ঝকঝকে জাপানি বাস। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি এবং জাপানি ভাষায় আমাদের স্বাগত জানানো হল, আর জানানো হল কোবে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগবে আন্দাজ ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট। ওসাকা শহর ছাড়িয়ে চলেছি—দু-চোখ জানলার বাইরে।

কোবেতে দুদিন কাটাবার পরে ঠিক করলাম আমরা কিয়োটো যাব। আমাদের ইচ্ছে ছিল কিয়োটোতে গিয়ে কোনও জাপানি হোটেলে থাকব—যাকে জাপানি ভাষায় বলা হয় রায়োকান। জাপানি আতিথেয়তার কথা বহু শুনেছি, পড়েছি—তবে চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ওই একরাত্রের রায়োকান বাসে।

কোবে থেকে ট্রেনেই কিয়োটো যাওয়া স্থির হল। সুপারফাস্ট ট্রেনে কিয়োটো যেতে ঘন্টা-দেড়েকের বেশি লাগে না। সকাল দশটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। স্টেশনের ঠিক বাইরেই ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার। একটা রাত্তির আমরা থাকব, কাজেই সারাদিনটা হাতে আছে। এই একটা দিনে কী কী দেখা যায় তার একটা লিস্ট ওঁরাই বানিয়ে দিলেন—বাস-রুট বলে দিলেন। ভাষা জানি না—তাই ভেবেছিলাম রাস্তাঘাট চিনে নিজেদের ঘুরতে অসুবিধে হবে। কিন্তু, সব কিছুর এত সুন্দর ব্যবস্থা যে, ভাষার ব্যবধানকে কোনও সমস্যা বলে মনেই হয় না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে জাপানি মন্দির, বিখ্যাত রক গার্ডেন—এই সব দেখা হল। বিকেলবেলা ট্যুরিস্ট সেন্টার থেকে দেওয়া একটা

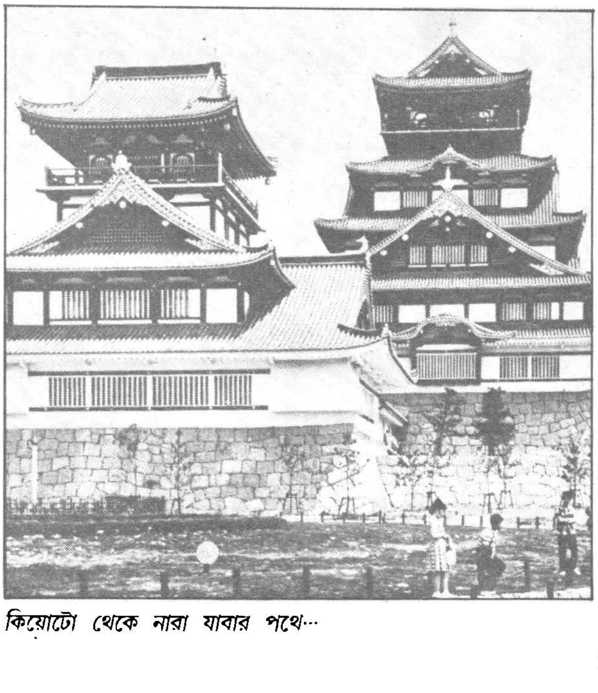

কিয়োটো থেকে নারা যাবার পথে···

রায়োকান-এর ঠিকানা খুঁজে বের করে সেখানে পৌঁছলাম। পাথরের দেয়াল-ঘেরা বাড়ি—কাঠের দরজা। বেল বাজাতে এক জাপানি ভদ্রমহিলার মুখ দেখা দিল দরজার ফাঁকে। আমরা বললাম ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার থেকে এখানকার কথা জেনেছি—ঘর খালি আছে কি ? যদি থাকে তা হলে একরাত্তির এখানে কাটাতে চাই। ইংরিজি ভাষা ভদ্রমহিলার বিশেষ বোধগম্য হল বলে মনে হল না। তবে অমায়িক হাসি হেসে আমাদের ইশারায় ভেতরে আসতে বললেন।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই জাপানি সৌন্দর্যজ্ঞানের সামান্য পরিচয় মিলল। পাথর-সাজানো সুন্দর রাস্তা চলে গেছে বাড়ির দিকে—গাছ দিয়ে নানাভাবে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়েছে ছোট্ট জায়গাটিকে। একপাশে পাথরের মধ্যে গর্ত করে জল ভরে রাখা হয়েছে—বাঁশের পাইপ বেয়ে ঝিরঝির করে জল পড়ছে সেখানে—সঙ্গে একটা বাঁশের তৈরি হাতা রাখা। প্রয়োজনে বাড়ি ঢোকার আগে হাত-মুখ ধোওয়া এবং জলপানও চলতে পারে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি লম্বা বেঞ্চি পাতা। তার সামনে সার-সার জুতো এবং কিছু প্লাস্টিকের তৈরি চটি। ব্যাপারটা সবে বোঝার চেষ্টা করছি দুজনে, দ্বিতীয় এক জাপানি মহিলার দেখা মিলল। ইনি কিছুটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজি বলতে পারেন। এঁকেও আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম। জানা গেল, ঘর আছে।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আমেরিকা ? আমেরিকা ?" অর্থাৎ আমরা কি মার্কিন মুলুক থেকে আসছি ? বুঝলাম হুজুগে মার্কিনিরা ছাড়া বিশেষ কেউ এই সব স্থানীয় হোটেলে থাকে না। আমরা 'ইণ্ডোজিন' অর্থাৎ ভারতীয় শুনে মহিলা যার-পর-নাই অবাক হলেন বলে মনে হল। ইতিমধ্যে আমাদের বাইরের জুতো খুলে ফেলতে হয়েছে—পরতে হয়েছে একজোড়া করে ওই প্লাস্টিকের চটি। ছেলেদের চটিগুলো সামান্য বড় আর সাদা রঙের—মেয়েদেরগুলো লাল। দু-পায়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই—ডান এবং বাঁ পা—দু পাটিই হুবহু এক। পরে বেশ মজা লাগল। কিন্তু, ব্যাপারটা কী সুন্দর বলো তো ? বাইরের জুতো পরে বাড়ি ঢোকা আমাদের এই প্রাচ্যদেশের রীতিতে বারণ ছিল এককালে। পাশ্চাত্ত্য হাওয়ার তোড়ে আমরা ভারতীয়রাও আজকাল জুতো মশমশিয়ে শোবার ঘরে পর্যন্ত ঢুকে পড়ি। দেখে ভাল লাগল জাপানিরা এই রীতিটা এখনও বজায় রাখতে পেরেছেন।

আমরা জুতো বদলাবার সময় ভদ্রমহিলা এসে জানালেন, ঘর রেডি। সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধপাস-ধপাস আওয়াজ করতে-করতে দোতলায় উঠলাম। বাড়িটা কাঠের তৈরি। কাঠের ফ্রেমের ওপর কাগজ লাগিয়ে দরজা—যেগুলো ঠেললে একপাশে সরে যায়। সেই রকমই একটা দরজা দুপাশে সরিয়ে কোমর বেঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের ঘরে আসতে বললেন ভদ্রমহিলা। এই ঘরে ঢোকার আগে আবার চটি খুলে ফেলতে হল, কারণ সমস্ত ঘরটা মাদুর দিয়ে মোড়া, জাপানি ভাষায় যে মাদুরের নাম 'তাতামি'। মুগ্ধতার আরও কিছু বাকি ছিল তখনও। সারা ঘরে একটা নিচু টেবিল ছাড়া কোনও আসবাবপত্র নেই। টেবিলের দু'পাশে দুটো নরম গদি—একপাশে একটা তাকের ওপর ফোন, রঙিন টি·ভি·। ব্যস, আর কিচ্ছু নেই। খাট না, পালঙ্ক না—কিচ্ছু না। ঘরে

ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে সারাদিন ঘোরাঘুরির ক্লান্তি দূর করছি, আবার সেই মহিলার প্রবেশ। টেবিলে এনে রাখলেন জাপানি চা। নিজে হাঁটু গেড়ে বসলেন, নিজের হাতে আমাদের চা পরিবেশন করলেন, সঙ্গে বিস্কুট। চা অর্থাৎ জাপানি সবুজ চা—দুধ-চিনি ছাড়া। তবে সারাদিনের ক্লান্তির পর গদির ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে (বসার কথা হাঁটু গেড়ে) গরম ধূমায়িত এই চা খেতে মন্দ লাগল না। এই ক'দিনে একটা জাপানি কথা শিখেছি, 'আরিগাত্তো গোদাইমাস্ত্' অর্থাৎ ধন্যবাদ। সেই ধন্যবাদ জানালাম মহিলাকে। মহিলাও 'আরিগাত্তো আরিগাত্তো' করে অস্থির হয়ে উঠলেন।

রাত্তিরের খাবার দিতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করাতে বললেন যে, আগে জানালে পারতেন। এখন আর হবে না। তবে কাল সকালে ব্রেকফাস্ট দিতে পারবেন। "তোমরা কি জাপানি প্রাতরাশ খাবে, না ওয়েস্টার্ন?" একটা কথা এখানে কবুল করতেই হবে, জাপানিদের সব ভাল—খাবারদাবার ছাড়া! আধকাঁচা মাছ—তাতে বিকট আঁশটে গন্ধ—কিছুতেই গলাধঃকরণ করা যায় না—অন্তত আমি অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। আমি অর্ডার দিলাম পাশ্চাত্ত্য প্রাতরাশ—আমার স্বামী বললেন, "দেখাই যাক না জাপানি প্রাতরাশ কী বস্তু!"

বাথরুমটা ঘর থেকে কিছুটা দূরে। হাত-মুখ ধুয়ে বেরোতে হবে ডিনারের সন্ধানে। প্লাস্টিকের চটি ফটর-ফটর করে বাথরুমের সামনে গিয়ে দেখি—এখানে আবার চটি বদলাতে হবে। বাথরুমে যাবার আলাদা চটি। ঘরের চটি খুলে, বাথরুমের চটি পরে নিলাম। চটি সামলাতেই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এসব খুঁটিনাটিগুলো ওরা দেখলাম খুব মেনে চলে। এতটাই মেনে চলে যে, মাঝে-মাঝে তা শুচিবায়ুগ্রস্তের পর্যায়ে চলে যায় বলে মনে হল।

বাইরে বেরিয়ে কাছেই একটা রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। জাপানি যদিও। ওদের প্রত্যেক রেস্তোরাঁর বাইরে শো-কেসে ওদের যা-যা মেনু তার এক নকল সংস্করণ সাজিয়ে রাখে। আমরা কিছুক্ষণ সেগুলো পর্যালোচনা করে ভেতর থেকে বেয়ারাকে ডেকে দেখিয়ে দিলাম কোন্‌টা আমরা চাই। সে দেখি আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুচকি-মুচকি হাসছে। আমি একটা টুটিফ্রুটি নিলাম—মাছটাছের আওতা থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ! আমার স্বামী যেটা নিলেন তার নাম তো অজানা—তবে তাতে একটি বস্তু ছিল—যার নাম স্কুইড! খুদে অক্টোপাস বলা চলে। কালো-কালো চোখ, লম্বা-লম্বা শুঁড়সমেত বাবাজি কাঠের থালার ওপর আসীন! এরকম সর্বভুক জাত দেখিনি কোথাও। স্কুইড খেয়ে তো ফেলা হল—তাতে নাকি বিশেষ কোনও স্বাদ নেই—রবার-রবার।

হোটেলে ফিরে আবার জুতো থেকে চটিতে পরিবর্তন, আবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা, ঘরে ঢোকা এবং আবার চমক। ঘরে দুটো মোটা-মোটা গদি পাতা (জাপানি ভাষায় এর নাম 'ফুটন'), তার ওপর দুটো হালকা নরম পালকের লেপ—একপাশে পাট করে রাখা রাত্তিরে পরে শোবার জন্যে দু'জনের দুটো ড্রেসিং গাউন। এরকম পরিপাটি নিখুঁত আতিথেয়তায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। জামাকাপড় ছেড়ে ওই ড্রেসিংগাউন চাপিয়ে লেপের মধ্যে ঢুকে স্বর্গসুখ অনুভব হল। ভাবলাম, একটু টি· ভি· দেখা যাক। টি· ভি· চালাতে গিয়ে দেখা গেল পয়সা পেটে না পড়লে এ বাক্স

উপর থেকে কিয়োটো শহরের একটি দৃশ্য

জীবন্ত হয় না। ১০০ ইয়েন (ভারতীয় মুদ্রায় ৫ টাকার মতো) ফেলতেই তিনি কথা বলে উঠলেন—আধঘণ্টা মতো চলে নিজেই 'চুঁই-ক' আওয়াজ করে আবার মৃত হয়ে গেলেন। নরম-গরম আরামে তখন ঘুম এসে গেছে। এদিকে আমার স্বামীর অবস্থা ক্রমশ কাহিল হচ্ছে। স্কুইড তার শোধ তুলতে আরম্ভ করেছে। শরীর অসম্ভব গরম হয়ে, পেট গরম হয়ে, সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। গায়ে লেপটেপ রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে—আমি তখন দিব্যি দু-দুটো লেপ চাপিয়ে তোফা ঘুম দিচ্ছি।

পরদিন সকালে উঠে আবার ওই সবুজ চা-ই বাধ্য হয়ে পান করলাম। ইতিমধ্যে প্রাতরাশ হাজির। খাবার-দাবার তো চেনা-জানা—ডিম, পাউরুটি, জ্যাম ইত্যাদি। আমার স্বামীর সামনে বসিয়ে দেওয়া হল বেশ বড়সড় একটা সুন্দর লাল গালার কাজ-করা ট্রে। তার ওপর দুটো ছোট, একটা বড় ঢাকা দেওয়া ওই কাঠেরই তৈরি বাটি—একটা পোর্সিলিনের প্লেট। বড় বাটির ঢাকা খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে একবাটি ভাত—বাকি বাটির দুটোতেই মাছের কী সব ব্যাপার—গন্ধেই তা মালুম হল—ছোট প্লেটে একটা মাছভাজা। আর সবশেষে ট্রের একপাশে রাখা একজোড়া চপস্টিক্। বাঙালির পর এত মাছ-ভাতের ভক্ত জাত পৃথিবীতে আর দুটি নেই বোধহয়। চারবেলা ভাত আর কাঁচা, আধকাঁচা, আধসেদ্ধ মাছ!

ফেরার সময় হল। ভদ্রমহিলাকে রাত্রিবাসের হিসেবপত্তর মিটিয়ে 'আরিগাত্তো গোদাইমাস্ত্' করে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। মহিলা আমাকে একটি ছোট্ট উপহার দিলেন—জাপানিদের কাগজের তৈরি পুতুল—যাকে ওরা 'ওরিগামি' বলে। সামান্য উপহার, কিন্তু অসামান্য তার ব্যঞ্জনা। ভাষার ব্যবধান কিছুটা ছিল গোড়া থেকেই—কিন্তু যত্ন-আত্তি এবং মুখের অনাবিল হাসি দিয়ে সে-সব দূরত্ব বুঝতেই দিলেন না ভদ্রমহিলা। ফিরে আসার সময় ছবি তুললাম দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ছবিটা ভিড়, ধুলো, ধোঁয়া জ্যামজটে-মোড়া কলকাতায় বসে যখন দেখি তখন ওই কাঠের বাড়িতে মাদুর-মোড়া ঘরে এক রাত্রিবাসের কথা কী রকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এক
সুপার ফাইটার
কি ক'রে দাঁতের গর্তের সঙ্গে
যুদ্ধ করল।
একদিন আমার ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল...
"মা, মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে"
"মানে, দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা"
দাঁতে গর্ত ?
তাকে বোঝালাম, কি ক'রে দাঁতকে একনাগাড়ে কত হামলা সইতে হয়...
"দাঁতে গর্ত হওয়ার কারণ হল, দাঁতের ফাঁকের খাবারের কণায় জীবাণু জমে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে, যা দাঁতের এনামেলের ওপর হামলা করে"
...আর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড কি ভাবে কাজ ক'রে ওর দাঁতে সুরক্ষিত রাখে...
Forhan's for the GUMS
with active FLUORIDE to check tooth decay
"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইডের ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে সত্যি-সত্যিই দাঁত শক্ত করে..."
..."ফলে, জীবাণু দাঁত ভেদ ক'রে গর্ত করতে পারে না"
"হুঁ হুঁ, আমার স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা
সুপার ফাইটার
আর, তার ওপর,
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড দেয়
ফরহ্যান্স-এর সেই সুবিখ্যাত যত্ন !
FOR THE GUMS
Forhan's
with active FLUORIDE to check tooth decay
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড মাড়ি সঙ্কুচিত করে, ক্ষয়ের মোকাবিলা করে।
404-GM-244 BEN

দোসরা এপ্রিলের বিস্ফোরণ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

ক্ষীরোদাসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ ভীষণ গোলমাল। স্কুলের বাইরে নানা ধরনের লোকজন থিকথিক করছে। ঈশ্বর-দরোয়ান গোঁফে তা দিচ্ছে আর লোক সামলাচ্ছে, "বারা বাজা তো কা হৈ। জানে কা অর্দার নেহি।"

যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দুবাবু এগিয়ে যান। খেঁকিয়ে ওঠেন, "আমরা হলাম গার্জিয়ান, আমরা যাব না? এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে?"

সত্যি, অভিভাবকরা বেলা বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে স্কুলে ঢুকতে পারেন, নোটিস বোর্ডে লেখা আছে। কিন্তু মুশকিল বেধেছে এই যে, সকলেই কাণ্ডটা শুনেছেন, সন্ত্রস্ত সবাই। বিমলদা রাশভারী লোক, তনুদা রগচটা, এঁরা স্কুল কমিটিতে জিতেছেন। ঈশ্বরপ্রসাদ তাঁদেরও ঢুকতে দেয়নি। এত লোককে একসঙ্গে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের জোর নির্দেশ। গাড়িতে এসেছেন ডক্টর ঘোষ, তিনি নেমেই সোজা ঢুকতে যাচ্ছিলেন, বাধা পেয়ে কিছুক্ষণ ইংরেজিতে তড়বড় করলেন, গাড়ি ঘুরিয়ে হিন্দিতে জানালেন, "হাম আভি হেডমাস্টার কো ফোন করতা হ্যায়। হোম মিনিস্টার কো ভি ট্রাংকল করে দেখেঙ্গে। মিলনেসে।" ট্রাঙ্ককলে হোম মিনিস্টার অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মিলনেসে অর্থাৎ পাওয়া গেলে কী হবে, উনি ভাঙেন না, জনতা চিন্তিত হয়।

রসময়বাবু নাতির খবর জানতে এসেছেন। ডাক্তারবাবুর উপর তাঁর রাগ আছে, আঙুলের ফোঁড়া অপারেশনের সময় ভালমতো অবশ না করেই চড়চড় করে কেটেছিলেন। উনি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাত নেড়ে শুনিয়ে দিলেন, "হুঁ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর মধ্যে কী করবেন আবার? যত্ত সব।" ওঁর বলার ঢঙে জনতার একাংশ হেসে উঠল। এই হাসি মিলিয়ে গেল অচিরেই। সবারই চিন্তা হচ্ছে, বেশিক্ষণ হাসা অসম্ভব।

সত্যি কোনও বিস্ফোরণ ঘটেছে কি না, কেউ জানে না। গুজব রটেছে, একটা নয় তিনটে বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে তিনটে নয়। কারণ, ট্রানজিস্টার ছিল একটা। একটা ট্রানজিস্টারে তিনটে বোমা থাকতে পারে না। লোক আরও বাড়ছে। এখন শুধু অভিভাবকদের নয়, ভিড় জমছে নানা ধরনের লোকজনের। টিফিনে যারা ছোলাসেদ্ধ আলুকাবলি বেচে, তাদের ভিড়, কোথায় একটা ক্রিকেট ম্যাচে লাপ্ত হয়েছে তার ভিড়, ক্লাবে যারা তাস খেলে আড্ডা মেরে ফিরছে তাদের ভিড়। সকলের এক কথা, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এরকম বোমা ফাটানোর দুর্বুদ্ধি খুবই অন্যায়। তনুদা

গর্জন করেন, "কাপুরুষ।" কে বা কারা যে কাপুরুষ বোঝা যায় না। বোমা ফাটিয়েছে যারা তারা,না স্কুল গেট খুলছে না যে সে, ওই সংক্ষিপ্ত কথায় বোঝা যায় না।

এমন সময় লাল মোপেডে দূর থেকে টুপি-পরা মণিদাকে আসতে দেখে জনতার অনেকে আশা করে, এবার কিছু জানা যাবে। মণিদা এ-শহরের সাংবাদিক। কিছু না জেনে কি এসেছেন ! তা ছাড়া উনি হয়তো আইডেন্‌টিটি কার্ড দেখিয়ে ভেতরে যাবেন। বেরলেই আসল খবরটা জানা যাবে। কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ। ঈশ্বর-দরোয়ানের কড়া ঘোষণা, "জানে কা পারমইশান নেহি।" কী আর করা, মণিদা জনতার কাছে খবর সংগ্রহ করতে থাকেন। কেউ বলে, ট্রানজিস্টার পাওয়া যায়নি, কেউ বলে গেছে, কেউ বলে, একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে, কেউ প্রতিবাদ করে, একটা কেন তিনটে আওয়াজ শোনা গেছে। তখন মণিদা এসব লিখে নেন। তারপর পুলিশ-ভ্যান আর জিপের ড্রাইভারের কাছে গিয়ে অন্য কোনও খবর সংগ্রহ করতে থাকেন।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা। ঈশ্বরপ্রসাদ গেটের তালা আর শেকল খুলে গেট টানে। সঙ্গে সঙ্গে হট্টমেলার দেশ। বাইরের যারা, তারা ভেতরে যেতে চায়। ভেতরের ছাত্ররা সংখ্যায় বেশি, শক্তিতে কম, ওরা চায় বাইরে যেতে। কেউ এগুতে পারে না, কেউ পিছোতে পারে না। বেশ জট-পাকানো গণ্ডগোল। পরেশবাবু ছেলেকে ডাকেন, "মান্তু !" মৃণালবাবু ডাকেন, "নোটন !" ডাক দুটো শোনায় কি সকলের মনে পড়ে যার যার নাতি-ভাইপো-ছেলেদের কথা ? সকলের ডাকে আর ছাত্রদের 'বাবা', 'উঃ', 'এই যে আমি', 'কাকু', 'চটিটা ছাড়ুন' ইত্যাদি চিৎকারে কিছুই শোনা যায় না।

ভিড় সরতে সময় নেয়। পুলিশরা বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ভ্যানে-জিপে চেপে হাওয়া। শেষমেশ বের হন মাস্টারমশাইরা। ও কী কাণ্ড ! রসময়বাবুর নাতির কান ধরে হেডমাস্টারমশাই জনার্দনবাবু আসছেন কেন ?

"কোথায় তোর দাদু," উনি খুবই চটেছেন বোঝা যায়।

রসময়বাবু মিনমিনে হয়ে যান, "কী হল মাস্টারমশাই ? এই যে এদিকে। বিল্টু এদিকে এসো। কী হয়েছে ভাই ?"

"বিল্টু না বিচ্ছু," কান ছাড়েন মাস্টারমশাই। চশমা ঠিক করে নেন। তারপর, "নাতিকে একটু-আধটু খবরের কাগজ পড়তে বলবেন, শুধু খেলার রিলে শুনলে চলবে ?"

বিল্টু দাদুকে পেয়ে জোর পেয়েছে, আর একবার বলে রিলে শোনার জন্য ও ট্রান্‌জিস্টারখানা আনেনি। ছোটকার জিনিস এটা, বাথরুমের তাকে পড়ে ছিল। ঘটনা তাই. জনার্দনবাবুও জেনেছেন, ট্রানজিস্টার সেটে ব্যাটারি ছিল না

বিল্টু ওটা এনে ক্লাসরুমের সামনে রেখে দেয় : হোঁচট খেয়ে পড়েন হারু-স্যার। তারপর থেকে এই বিপত্তি পড়েই উনি লাফিয়েছিলেন "বোমা !" আসলে এতখানি করার ইচ্ছে বা সাহস বিল্টুর ছিল না। সে চেয়েছিল, ক্লাসের কেউ তুলে নিলেই 'এপ্রিল ফুল, এপ্রিল ফুল' বলে হাততালি দেবে।

রসময়বাবু হাসেন, "শাবাশ ! কিন্তু দাদু, আজকে তো এপ্রিল ফুল নয়, আজ তো সেকেণ্ড এপ্রিল।"

"তা আমি কী জানি। গতকাল তপন-গণেশ-সত্যরা আমাকে অমন করে ফেলে দিল কেন ?"

হ্যাঁ, তপন-গণেশ-সত্যরা ভারী ফাজিল। বিল্টুকে বলেছে, 'অমল-স্যারের পড়ানোটা দেখা।' অমল-স্যার দাঁড়িয়ে পড়ান। বিল্টু সেটা দেখায়, কে জানত, ওদের অমন কুবুদ্ধি, 'এবার মধু-স্যারের মতো দেখা তো দেখি।' পিছন থেকে চেয়ার কখন টেনে নিয়েছিল ওরা। মধু-স্যার কখনও বসে-বসে ঝিমোন, কখনও হেঁটে-চলে পড়া ধরেন। বিল্টুর কী দোষ !

রসময়বাবু নিচু হয়ে দেখেন, তাঁর নাতির কনুইতে খয়েরি হয়ে রক্ত জমে আছে। জনার্দনবাবু মৃদু স্বরে ডাকেন. "আর কোথাও লাগেনি তো রে ?" পরক্ষণেই হাঁকেন, "ঈশ্বরপ্রসাদ ! বেত-জোড়া রেডি করকে রাখনা।"

বোঝা গেল তপন-গণেশ-সত্যরা কালকে হাতে-হাতে নিষ্ঠুর এপ্রিল ফুলের মজাটা টের পাবে। কিন্তু, বিল্টু জানত না ট্রান্‌জিস্টার বোমা ফাটার খবর। তাই অমন প্ল্যান করেছিল। মাস্টারমশাইরা এতক্ষণে চলে গেছেন বা যাচ্ছেন। ক্যালেণ্ডারে নেই এমন একটা ছুটি পেয়ে সবাই প্রায় খুশি। জনার্দনবাবু বিল্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে রসময়বাবুকে নিচু স্বরে বলেন, "দিনকাল কেমন হয়ে গেছে মশাই, এইটুকু দুধের বাচ্চাকেও জানতে হবে সন্ত্রাসবাদের কথা !"

ঢডং-ঢং ঢডং-ঢং করে তখন স্কুলের দিকে কাঁপতে কাঁপতে আসছিল একটা দমকল, ওরা দেরিতে খবর পেয়েছে বোধহয় !

ছবি : দেবাশিস দেব

এপ্রিল শব্দটা কোত্থেকে এল

এপ্রিল মাস শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এপ্রিল কথাটা এল কোত্থেকে ? প্রাচীন কালের রোমানরা এই এপ্রিল মাসকে মনে করতেন ভেনাস দেবীর মাস। তা ভেনাস দেবীকে গ্রিকরা বলতেন আফ্রোদিতে। সেইজন্যে অনেকে মনে করেন যে, আফ্রোদিতে থেকেই এপ্রিল কথাটার সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকের ধারণা যে, তা নয়, এপ্রিল কথাটা এসেছে লাতিন শব্দ aperire থেকে। এই লাতিন শব্দটার অর্থ হল to open। তা যদি হয়, এপ্রিল মাসটা তা হলে একটা চমৎকার তাৎপর্য পেয়ে যায়। বিশেষ করে পাশ্চাত্য পৃথিবীর মানুষদের কাছে। কেননা, মার্চে সেখানে যেমন বৃষ্টি পড়ে, তেমনি ছোটে ঝোড়ো হাওয়া। তারপর এপ্রিলে শুরু হয় বসুন্ধরার আবার সেজে উঠবার পালা। মনে হয়, পৃথিবীর ঘোমটা যেন ফের খুলে যাচ্ছে।

বড়গল্প

পণ্ড পিকনিকের উৎসে

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

মাঝ পথে রণে ভঙ্গ দিয়ে অভ্র যে হঠাৎ এইভাবে পালাবে বা পালাতে পারে, এ আমার কল্পনারও অতীত। অথচ অধ্যবসায়, ধৈর্য আর স্থৈর্যে তার মতো ছেলে, বাপ হয়ে বলাটা হয়তো ঠিক নয়, এখনকার দিনে সত্যিই বড় দুর্লভ। আগুন, শত্রু আর ঋণ—এ তিনের শেষ যেমন রাখতে নেই, অভ্রের মতে শুরু করা কাজের বেলাতেও তেমনি। অর্থাৎ কোনওরকম ওজর দিয়ে মাঝপথে থেমে যাওয়াটাও একটা মস্তবড় অপরাধ। যাকে বলে একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ।

অথচ সেই অপরাধে অপরাধী আজ সে নিজেই!

এদিকে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার জোগাড়!

মিঃ লাহিড়ী বারবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছেন, শুকনো পাতায় মর্মর তুলে কখনও বা পায়চারি করছেন অস্থির পায়ে, কখনও বা আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভুরুজোড়া কুঁচকে প্রশ্ন করছেন, "তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো, যাবার সময় কিছু বলে যায়নি?"

আমার গলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ফুটে উঠল কি না জানি না, তবে বললাম, "না, আমাকে কিছু বলে যায়নি। তা ছাড়া, ও তো ছিল আপনার কাছেই, কিছু বলবার হলে আপনাকেই বলে যাবার কথা।"

মিঃ লাহিড়ী আর কোনও কথা বললেন না, শুকনো পাতায় তেমনি মর্মর তুলে পায়চারি করতে লাগলেন আপন মনে।

মাঝ থেকে আমি পড়লাম বিপাকে। ছেলে আমার, সুতরাং অভ্রর এই না-বলে যাওয়ার দোষটা যেন মনে হল আমারই।

বিশ-ত্রিশ হাত দূরে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো তখনও ঝিকমিকিয়ে উঠছে স্টেইনলেস স্টিলের থালা-বাটি-গেলাসগুলোর ওপর। পাতার জাফরির আলোয় জাজিমটাকে দেখাচ্ছে চিতাবাঘের ছালের মতো। তারই একধারে হাত চার-পাঁচ তফাতে একটা জ্বলন্ত উনুনের গনগনে আভা নিবে গিয়েও যেন নিবে যায়নি, ছাইয়ের একটা পাতলা আস্তর তপ্ততাকে আস্তে আস্তে শান্ত করে দিচ্ছে শুধু। চারদিক ঠাণ্ডা, আর কেমন নিঃশব্দ। এবং নির্জনও।

মহকুমা শহর থেকে মাইল-আষ্টেক দূরে কংসাবতীর একটা প্রশাখা-ঘেরা এই সমতলভূমিটা শুধু মনোরম বললে ভুল হবে, পিকনিকের পক্ষে এমন আদর্শ জায়গা কদাচ পাওয়া যায়।

চারদিকে নিবিড় শালবন, দূরে ছোট-ছোট পাহাড় যেন শান্ত ছেলের মতো চুপ, কোলে কাকচক্ষু জল নিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে শীর্ণরেখা নদী একটা। লোকবসতি নেই, কিংবা কম বলে চারদিকে কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শুধু উত্তরে হাওয়ার আনাগোনা আর শালের মর্মর। আমি সামান্য চাকুরিজীবী এবং সংসারী, নইলে শব্দময়ী শহর কলকাতার স্থায়ী বাস ছেড়ে হয়তো কবেই চলে আসতাম এই মুখর নিরালায়।

মিঃ লাহিড়ীর মতো বহু-দেখা মানুষটার মনও বুঝি নাড়া খেয়ে গেছে এই জায়গাটায় এসে। তাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে অভ্রর দিকে তাকিয়ে তিনি বারবার তারিফ করতে লাগলেন তার পছন্দের।

অভ্র কবে কোন্ ফাঁকে কার সঙ্গে এসে দেখে গেছে জায়গাটা জানি না, তবে কাল রাত্রে হঠাৎ যখন পিকনিক স্পট খোঁজার কথাটা উঠল, আগ বাড়িয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমি একটা জায়গার সন্ধান তোমাদের দিতে পারি বাবা, যদি আমার ওপর আস্থা থাকে, তা হলে কাল সকালে দেখে আসতে পারো আমার সঙ্গে গিয়ে। সাইকেলে আধ-ঘণ্টাটাক লাগবে যেতে।"

সপরিবারে ক'দিন হল এসেছি শম্পার বিয়েয়। শম্পা অভ্রর এক মাসতুতো দিদি। সঙ্গে আমাদের মিঃ লাহিড়ীও ছিলেন। এই বিয়েতে তাঁর অবশ্য নিমন্ত্রণ হবার কথা নয়; কিন্তু কী খেয়াল হল কে জানে, নতুন মেসোমশাইকে বলে অভ্র বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়ে তবে ছাড়ল। আর মিঃ লাহিড়ীকেও বলিহারি, নির্লজ্জের মতো এককথায় তিনিও কেমন রাজি হয়ে গেলেন। সেটা অবশ্য অভ্রর প্রতি অপত্য স্নেহে, না পুকুরের টাটকা মাছের লোভে জানি না। হ্যাজাকের আলো, উলুধ্বনি আর শাঁখে বিয়ের আসর যখন সরগরম, আমরা ক'জন তখন পাশেই একটা দোতলা বাড়ির ঘরে বসে গুলতানি করছি। সেই গুলতানির আসরে জমায়েত হয়েছিল অনেকেই, কারণ মধ্যমণি ছিলেন মিঃ লাহিড়ী। নানান গল্পে আমরা যখন বেশ মশগুল, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে ছুটে এল শুভ্র। এসেই অভ্রকে বললে, "জানিস দাদা, শম্পাদি বলেছে আমরা একটা পিকনিক করব। মেসোমশাই পুকুরের মাছ দেবেন, আর শম্পাদি দেবে টাকা। বেশ মজা হবে, না রে?"

সেই মজার জায়গা দেখতেই অভ্রর কথামতো বেরিয়ে পড়লাম সকালের জলখাবার খেয়েই। মিঃ লাহিড়ী দেখলাম বেশ উৎসাহী, আমাদের সঙ্গ নিলেন। এই বয়সেও পল্লীগ্রামের এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তায় যেভাবে অক্লেশে সাইকেল চালিয়ে চললেন তিনি, দেখে অবাক হতে হয়। তখন আটটা বেজে গেছে। আমাদের ফিরতে হবে সাড়ে-দশটা এগারোটার মধ্যেই। বর-কনে বেরিয়ে যাবার আগেই।

অভ্র বললে, "তুমি কোনও চিন্তা কোরো না বাবা, আমাদের যেতে আসতে সময় লাগবে ঘণ্টাখানেক। আর, ওখানে খুব বেশি হলে আধঘণ্টাটাক থাকব আমরা। যাচ্ছি যখন, আশপাশটাও দেখে নেব তো!"

রাস্তা কাঁচা হলেও বেশ চওড়া। লরি না থাক, টেম্পো কিংবা ছোট্ট স্কুলবাস দিব্যি যেতে পারবে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তো তুলনাই নেই। জেলা-পরিষদ কিংবা গ্রাম-পঞ্চায়েতকে নিজে থেকে কিছু করতে হয়নি, প্রকৃতি নিজেই যেন সাজিয়ে দিয়েছে সব কিছু। গ্রাম শেষ হতে বাঁধের রাস্তা পড়ল। বেশ উঁচু বাঁধ। দুধারে সবুজ ফসলের ক্ষেত দিগন্তের নীলে গিয়ে মিশেছে। তখন হাওয়া ছিল না, তবে ঠাণ্ডাটা কনকনে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা আর সদ্য-দোহন-করা দুধের ফেনার মতো সকালের ঈষদুষ্ণ রোদ আমাদের তিনজন সাইকেল যাত্রীর দেহে-মনে যেন এক অব্যক্ত মায়াজাল সৃষ্টি করল। আমরা গল্প করতে-করতে এবং না করতে-করতে এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে।

বাঁধরাস্তা থেকে নেমে আমরা গিয়ে পড়লাম একখানা গ্রামে। তবে সেটা নামেই গ্রাম। দোকানপাট নেই বিশেষ, লোকবসতিও কম। তালপাতা কিংবা খড়ের ছাউনির দু-চারখানা মেটে ঘর। শালের জঙ্গল শুরু বলতে গেলে সেখান থেকেই। প্রথমে ছড়ানো-ছিটোনো দু-চারটে, তারপর যতই এগোতে লাগলাম, ঘন হতে হতে সেই জঙ্গল ঘনতর হয়ে থেমে গেছে নদীর কোলে গিয়ে। নদীর ওপারেও কিছুটা জায়গা জুড়ে সেই জঙ্গলের আভাস, তারপরই ছোট-ছোট পাহাড়ের সার আকাশে হেলান দিয়ে পরম আলস্যে দিব্যি রোদ পোহাচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কী, পিকনিকের চিন্তা তখন আমার মন থেকে একেবারেই উবে গেছে। শুধু আমার নয়, অভ্রদীপ এবং মিঃ লাহিড়ীরও সম্ভবত। কারণ অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে, চলমান অবস্থাতেই নিষ্পলক চোখে আমরা শুধু তাকিয়েই থেকেছি এধার-ওধার। চক্রাকারে চারদিক ঘুরতে-ঘুরতে কতক্ষণ কেটেছে এইভাবে জানি না, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলাম মিঃ লাহিড়ীর গলায়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন, "চলো হে চাটুজ্যে, চলো অভ্রদীপ, এবার ফেরা যাক।"

গাড়ির মুখ ঘুরিয়েই কিন্তু হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। এবং থমকে গেলেন। ভুরু দুটো স্বতই কুঁচকে উঠল তাঁর। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে কিছু দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে উঠলেন, "আরে, এখানে তো পিকনিক করতে অনেকেই আসে দেখছি! কিন্তু—" আমাদের সঙ্গে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন মিঃ লাহিড়ী, "কিন্তু লোকজন কোথায়? সরঞ্জাম আছে, আয়োজনও তৈরি, অথচ লোকজন কেউ নেই, এ ভারী আশ্চর্য তো!"

এধার-ওধার তাকালেন মিঃ লাহিড়ী। দু-চারটে উড়ে-যাওয়া পাখি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না কোথাও। বললেন, "চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি কী ব্যাপার!"

পিকনিক-স্পটের একেবারে কাছে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী। ঘাসের ওপর বিরাট একটা জাজিম বিছানো, আশপাশে পিকনিকের সরঞ্জাম যেমন ছড়ানো-ছিটানো থাকে, তেমনি। বেতের বাস্কেট, কাপ-ডিশ-গেলাস-চামচে, থার্মোফ্লাস্ক। এবং আরও কত কী।

পলকের জন্যে একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "এ তো দেখছি পণ্ড পিকনিক!"

কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন না করে পারলাম না, "মানে? পণ্ড পিকনিক মানে?"

মৃদু হাসলেন মিঃ লাহিড়ী। বললেন, "পণ্ড পিকনিক মানে বোঝো না? পিকনিক বাতিল করে ভোজনকারীরা হঠাৎ

কোথায় চলে গেছেন, আর ফেরেননি !"

বিস্ময়ে আমার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল কি না জানি না, তবে মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন, "অমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী ? যা বলছি ঠিক তাই। একটা কোনও ঘটনা এমনই আকস্মিক ভাবে ঘটেছে যে, খাওয়ার প্লেট ছেড়ে সবাই দৌড়েছে একসঙ্গে— ।"

আমার বিস্মিত মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "ষাঁড়ে তাড়া করেনি তো ?"

"কী বললে ? ষাঁড়ে তাড়া করেছে ?" একটু করুণ হাসি হাসলেন মিঃ লাহিড়ী, "ধরেছ ঠিকই। ষাঁড়েই তাড়া করেছে বটে। তবে ভাগ্যের ষাঁড়—দুর্ভাগ্যের ষাঁড়ও বলতে পারো।"

আমি তখন যাকে বলে একেবারে হতভম্ব, হতবাক। অভ্রর দিকে একবার তাকালাম। দেখি, সেও নিশ্চুপ। সাইকেল থেকে নামেওনি সে তখন, বাঁ-পাটা তখনও প্যাডেল ছুঁয়ে, শুধু রিভলভিং ফ্যানের মতো মাথাটা তার একবার এদিক একবার ওদিক করছে। অর্থাৎ জাজিমের ওপর ছড়ানো সরঞ্জাম থেকে হাত-বিশেক দূরের জ্বলন্ত উনুনটা পর্যন্ত। চোখ দুটো দেখেই মনে হয়, কী যেন ভাবছে সে। কিংবা এমনও হতে পারে, কিছুই ভাবছে না—আমারই মতো অবস্থা তখন তার।

মিঃ লাহিড়ীর দৃষ্টি তখন দূরে, অনেক দূরে সমস্ত শালবনটাকে ঘিরে ঘোরাফেরা করছে। বোধহয় কোনও মানুষজনেরই সন্ধান করছেন তিনি। কিন্তু না, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেউ কোত্থাও নেই। অনেকক্ষণ পর একসময় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা, বলো তো চাটুজ্যে, কিছু অনুমান করতে পারছ কি না ? অর্থাৎ এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে যাতে সব ক'টা মানুষ এমন আনন্দময় পরিবেশ ছেড়ে হঠাৎ একসঙ্গে উধাও হয়ে গেল ?" একটু থামলেন মিঃ লাহিড়ী, জাজিমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এখানে দেখছ পাঁচ জায়গায় পাঁচটা প্লেট, কলা, ডিম আর সন্দেশ সাজানো। এর মধ্যে চারটে প্লেটের খাবারের পরিমাণ সামান্য কম-বেশি হলেও প্রায় একইরকম। কিন্তু ওপাশের প্লেটটার খাবার অনেক কম—অর্ধেকই বলা যেতে পারে। প্লেটটাও ছোট। চারটে প্লেটের খাবার কিছু কিছু খাওয়া হয়েছে। কিন্তু ছোট প্লেটের খাবার ছোঁওয়া পর্যন্ত হয়নি। চারটে প্লেটের পাশে চারটে জলের গ্লাস, কফির কাপ, কিন্তু ছোট প্লেটটার পাশে জলের গ্লাস ছাড়া কফির বদলে একগ্লাস দুধ। আর ওই যে দেখছ পাউরুটি—ওগুলো স্লাইস করা হয়েছে, কিন্তু মাখন লাগানো হয়নি। অথচ মাখনের যে মোড়কটা পাশে রয়েছে, সেটা প্রায় শূন্য বললেই হয়। যেটুকু আছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে চার আঙুলের ছাপ নয়, দাগ।"

কথাগুলো মিঃ লাহিড়ী গড়গড়িয়ে বলে গেলেন বটে, কিন্তু আমার কানে অর্ধেকও ঢুকছে কি না সন্দেহ। আমার মন পড়ে আছে তখন বিয়েবাড়িতে। বর-কনে বেরোবার আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে। এদিকে ঘড়িতে তখন প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। পথটা আধ ঘণ্টার ঠিকই, কিন্তু গল্প করতে করতে আসার ফলে আমাদের লেগেছে পঞ্চাশ মিনিটের ওপর। এখানে এসেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গেছি আমরা যে, নির্ধারিত সময়ের অনেক বেশিই পার হয়ে গেছে। এখন হাতে যা সময় আছে, তীরের বেগে সাইকেল নিয়ে ছুটলে হয়তো আমরা সময়মতো বাড়িতে

পৌঁছতে পারব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আবার রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে মন দিই, তা হলে যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছনোর দফারফা। কী করব সেটা ভাবতেই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। অথচ মুখের ভাবখানা এমন করলাম যেন রহস্যোদ্ঘাটনের কথাটাই আমি চিন্তা করছি। মিঃ লাহিড়ী তখন তাঁর টোব্যাকো পাইপ ধরিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে একমনে কী চিন্তা করে চলেছেন।

মিনিট-কয়েক কেটেছে বোধহয়, হঠাৎ পেছন থেকে মিঃ লাহিড়ীর গলা শুনতে পেলাম, "ওহে চাটুজ্যে, অভ্র কোথায় গেল, অভ্র ?"

"কোথায় গেল মানে ?" চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে বললাম, "এই তো এইমাত্র এখানে আমাদের সঙ্গেই ছিল !"

"ছিল তো জানি, কিন্তু এখন কোথায় ?"

মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে এধার-ওধার যতদূর দৃষ্টি যায় তাকালাম। কিন্তু কোথায় অভ্র ?

ঘড়ির কাঁটা তখন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর ডিঙোচ্ছে। বললাম, "ও বাড়ি চলে যায়নি তো ?"

ভুরু কুঁচকে মিঃ লাহিড়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "বলছ কী হে ? বাড়ি চলে যাবে ? এইভাবে না বলে ? ও কি তোমার তেমন ছেলে ?"

"তা অবশ্য নয়—" মিঃ লাহিড়ীর কথার মাঝে বলে উঠেই চুপ করে গেলাম। না বলে হঠাৎ এইভাবে চলে যাবার মতো চঞ্চল মস্তিষ্কের ছেলে যে অভ্র নয়, তা আমি ভালভাবেই জানি। কিন্তু সত্যিই তো, গেল কোথায় ?

হঠাৎ একটা ধারণা আমার মাথায় গজিয়ে উঠল। যদিও সেটা মিঃ লাহিড়ীর কাছে ব্যক্ত করলাম না। যে রহস্যোদ্ঘাটনের ভার মিঃ লাহিড়ী আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, আমি তো পারবই না, হয়তো সেটা অভ্রর পক্ষেও সম্ভব হবে না বুঝেই সে যঃ পলায়তে সঃ জীবতি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা, অর্থাৎ মিঃ লাহিড়ী এবং আমি তো তখন দূরে-দূরে যে যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি।

আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে এগারোটা প্রায় হতে চলল, অভ্রর দেখা নেই। বারোটা বেজে গেল, তবুও।

পায়চারি থামিয়ে মিঃ লাহিড়ী বললেন, "চলো তো বাড়ি ফিরে যাই, গিয়ে দেখি যদি..."

"তাই চলুন," বলে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

পৌঁছলাম যখন, একটা বেজে গেছে। বর-কনে চলে গেছে কখন। সারা বাড়িতে থমথমে একটা করুণ নীরবতা। নিজের জিনিসকে চিরজীবনের মতো পরের হাতে তুলে দেওয়ার যে দুঃখ, সেই দুঃখেই কাতর সকলে। সময়কালে আমরা যে ছিলাম না, সে-কথা খেয়ালই হয়নি কারও।

আমাকে দেখেই শ্রীমতী বীথি ফোলা-চোখে এগিয়ে এসে বলল, "অভ্রকে দেখিনি অনেকক্ষণ, সে কোথায় ?"

"জানি না তো।"

বুঝলাম, অভ্র এখানে আসেনি। তবু ভাঙলাম না কোনও কথা। সদ্য কন্যাবিদায়ের দুঃখে ভারাক্রান্ত সকলে। এইসময় নতুন কোনও খবর শোনানো মানেই বিব্রত করা সকলকে। খেয়ালি বয়স অভ্রর, নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক কোথাও ঘুরছে, ফিরে আসবে যথাসময়েই।

"সেই সাতসকালে ক'খানা বাসী লুচি আর বোঁদে খেয়ে বেরিয়েছে, এখনও ফেরবার নাম নেই," কথাটা বলেই বীথি আমার মুখের দিকে তাকাল, "তা তোমার মুখ এমন ভার কেন ? কোথায় গেছলে ? অনেকক্ষণ তো দেখতেও পাইনি। মিস্টার লাহিড়ী কোথায় ?" জবাবের প্রত্যাশায় না থেকে একটু থেমেই সে আবার বলল, "নাও নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে। চানটান যদি করো তো করে নাও। মিস্টার লাহিড়ীকেও বলো করতে। অভ্র যখন আসবে, আসবে—।"

"শুভ্র কোথায় ?"

"ক্যারমবোর্ড নিয়ে বসেছে।"

বালতি হাতে কুয়োতলার দিকে এগোল বীথি। আমিও পায়ে পায়ে এগোলাম আমাদের ঘরের দিকে। পাশের বাড়ির সেই দোতলায়। মিঃ লাহিড়ী তখন জামা-প্যান্ট ছাড়ছেন। বললেন, "সত্যিই, কী ব্যাপার বলো তো চাটুজ্যে ? গেল কোথায় ছেলেটা ?"

স্নান করলাম, খাওয়াদাওয়া সারলাম, এবং হাত-পা ছড়াবার জন্যে একটা বিছানার আশ্রয়ও নিলাম, কিন্তু মনে স্বস্তি নেই এতটুকু। কেবলই মনে হচ্ছে, এই হয়তো দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল অভ্র, মুখ-চোখ রোদে কালো, চুল উশকোখুশকো, আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বলে উঠবে, 'জানো বাবা—' কিংবা হয়তো পাশের বাড়ি থেকে তার মায়ের গলা পাব, 'কোথায় গেছলি বল তো সেই সকাল থেকে ? যা, আগে তোর বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। করে এসে, চানটান কিছু করতে হবে না,খেতে বসে যা !'

কিন্তু না, কোনও আওয়াজই নেই, ঘরের পুব-দেয়ালে সেকেলে জাপানি ঘড়িটা শুধু টিকটিক করে বেলা বয়ে যাওয়ার আভাস দিয়ে চলেছে। শীতের বেলা, তায় পাড়াগাঁ,কেমন যেন নিঝুম হয়ে আসছে চারদিক। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে এর মধ্যে বার-তিনেক এসে অভ্রর মা ঘুরে গেছে ঘরে। অভ্রর নতুন মাসিমা, মেসোমশাই, তাঁদের মেয়ে শিখা থেকে শুরু করে ছেলে তনু, তপন সবাই একবার করে আসছে আর যাচ্ছে। হাজারো প্রশ্ন, হাজারো 'মনে হওয়া', হাজারো আশ্বাস। শেষে, কোথায় কোন কালীতলার মাঠে মেলা বসেছে,সেখানেও যেতে পারে আশা করে যখন মিঃ লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বেরোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় নীচের উঠোনে শোরগোল শোনা গেল।

চকিতে জানলার কাছে ছুটে গেলাম। এবং গিয়ে দেখি...।

হ্যাঁ, অভ্রই বটে ! সাইকেল থেকে নামছে।

মুহূর্তখানেক সময় গেল নিজেকে সামলাতে। তারপর ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ওর মাকে বললাম, "আগে হাত-পা ধুয়ে ও চাট্টি খেয়ে নিক। তারপর শুনো'খন ও কী বলতে চায়।"

মিঃ লাহিড়ী আমার পাশে জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, "যাক, বাঁচা গেল ! বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল ছেলেটা !"

সবেদা গাছের গুঁড়িতে সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে রেখে কুয়োতলায় গিয়ে হাত-পা ধুল অভ্র কিন্তু খেল না। বললে, "খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে আমার। একটু বাদে বাবা আর জেঠুকে যখন চা দেবে, রাগ কোরো না মা, আমাকেও একটু দিও। মাথাটা বড্ড ধরেছে আমার !"

অভ্র ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই মিঃ লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলেন, "বাচ্চাটা কেমন আছে অভ্র ?"

মিঃ লাহিড়ীর কথায় চমকে উঠলাম। বাচ্চা ! কার বাচ্চা ? কোন বাচ্চা ? এ কী বলছেন মিঃ লাহিড়ী।

মুচকি হেসে অভ্র স্বাভাবিক গলাতেই জবাব দিল, "ভালই ! এখন বাড়ি নিয়ে গেছে ওর বাবা-মা। সাতদিন বাদে একবার আউটডোরে নিয়ে আসতে বলেছেন ডাক্তাররা।"

আমার কৌতূহল তখন চরমে উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন না করে পারলাম না, "কার কথা বলছিস রে তুই, অভ্র ?"

"পিকনিক করতে গিয়ে যে-বাচ্চাটা পুড়ে গেছল !"

"মানে !" যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

বিছানার প্রান্তে বসতে বসতে অভ্র বলল, "বলছি, বলছি, সব বলছি। আগে একটু হাঁপ ফেলতে দাও। কত মাইল সাইক্লিং করেছি আজ জানো ? অন্তত কুড়ি মাইল !"

মিনিটখানেকের জন্যে একটু থামল অভ্র। তারপর শুরু করল, "আজ সকালে পিকনিক স্পট থেকে পাঁচজনের যে দলটাকে ষাঁড়ে তাড়া করেছিল বলে তুমি বলেছিলে, সেটা একেবারে ভুল। ষাঁড় ও অঞ্চলে নেই, অন্তত যাতায়াতের পথে একটাও চোখে পড়েনি। পিকনিকের সরঞ্জামগুলো দেখে লাহিড়ীজেঠু আসল ঘটনাটা ঠিকই অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই বলেছিলেন 'দুর্ভাগ্যের ষাঁড়ে তাড়া করেছে।' আমি জেঠুর শিষ্য, আমিও কতকটা সেইরকমই আন্দাজ করেছিলাম এবং সেটা মুখে প্রকাশ করার আগে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। তাই তোমাদের কাউকে

কিছু না বলে তোমরা যখন যে-যার নিজেদের চিন্তাতেই বিভোর, ফাঁক বুঝে সাইকেল নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, অগ্নি-দুর্ঘটনা যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হলে প্রথমেই তারা যাবে কোনও ডাক্তারের কাছে, কিংবা হাসপাতালে। গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার বড়-একটা মেলে না, মিললেও পোড়া-কেসের চিকিৎসা করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। তা হলে উপায় ? উপায় একমাত্র হাসপাতাল। তা, সে তো শহর ছাড়া মিলবে না কোথাও। ছুটলাম শহরের দিকে,যেটা এখান থেকে অন্তত মাইল-আষ্টেক দূরে। গেলাম এবং এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে দেখলাম, আমার ধারণা বিন্দুমাত্র ভুল নয়। বনভোজনকারীরা বিমর্ষ হয়ে ঘোরাফেরা করছে এবং দুজন ডাক্তার একটি অর্ধ-অচেতন বছর-ছয়েকের মেয়েকে টেবিলে শুইয়ে তার পরিচর্যা করছেন। ওঁদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, ভোজনকারীরা যখন ব্রেকফাস্টের আয়োজনে এবং মনোরম পরিবেশের আনন্দে মশগুল, তখন তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ দ্যাখে, একটা ছোট্ট গাছের ডাল নিয়ে মেয়েটি আগুনের প্রায় কোলের কাছে গিয়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ও কী করছিস,ও কী করছিস ?' বলে চিৎকার করে উঠতেই মেয়েটি হকচকিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় তার ফ্রকের তলার অংশে এবং চোখের পলকেই সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার সারা শরীরে। ভোজনকারীরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে টেনে তোলে এবং সবাই মিলে হাত চাপড়ে চাপড়ে আগুনটাকে দেয় নিবিয়ে। মেয়েটি তখন আগুনের তাপেই হোক আর ভয়েই হোক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। প্রাথমিক করণীয় হিসেবে হাতের কাছে মাখনের যে মোড়ক ছিল, তা থেকে দলা দলা মাখন দিয়ে মেয়েটির শরীরের পোড়া জায়গাগুলোয় লাগিয়ে দিয়ে বনভোজনকারীরা জিপ নিয়ে ছোটে শহরের হাসপাতালের দিকে। তারা অবশ্য ওই শহরেরই লোক, তাই মিনিট-পনেরোর মধ্যেই তারা সোজা পৌঁছে যায় হাসপাতালে। তবে ভগবান সহায়, ডাক্তাররা যা বললেন, বাইরে থেকে আগুন দেখে যতটা আশঙ্কা করা গেছল, আসলে ক্ষতি ততটা হয়নি। পুড়েছে, জায়গায় জায়গায় ফোশকাও পড়েছে, তবে কোনও ক্ষতই তত গভীর নয়। ডাক্তাররা আশা করছেন, ভালভাবে শুশ্রূষা করলে মাসখানেকের মধ্যেই মেয়েটির পোড়া দাগগুলো পর্যন্ত মিলিয়ে যাবে।"

একটু থামল অভ্র, বোধহয় দম নিল। তারপর বলতে লাগল, "বনভোজনকারীদের দুজন মেয়েটিকে নিয়ে সাইকেল-রিক্শা করে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং বাকি দুজন সাইকেল সমেত আমাকে জিপে তুলে নিয়ে আবার সেই পিকনিক-স্পটে ফিরে এলেন সরঞ্জামগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। খাবারগুলো অবশ্য তাঁরা ফেলেই দিলেন। তবে আমাকে ছাড়লেন না কিছুতেই, টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়িতে। মেয়েটির তখন জ্ঞান ফিরেছে, কথাবার্তা বলছে। আমার কোনও ওজরই শুনলেন না, জোর করে আমাকে খাইয়ে দিলেন একপেট।"

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল অভ্র। সকৌতুকে বলল, "এখনও তোমার কৌতূহল মেটেনি তো বাবা ? বলি, শোনো। পিকনিক করতে যে মোট পাঁচজন গিয়েছিল, সেটা বোঝা যায় মোট পাঁচটা খাবারের প্লেট দেখে। তাদের মধ্যে যে একজন বাচ্চা আছে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়, একটি ছোট প্লেট, কফির বদলে দুধের গ্লাস দেখে। দুর্ঘটনা যে একটা কিছু ঘটেছিল, সেটা জানা যায় দুটো জিনিস লক্ষ করে। এক, সাজানো খাবার ফেলে একসঙ্গে সবার উধাও হয়ে যাওয়া, আর দুই হল, মাখনের মোড়ক। স্লাইস করা রুটিতে মাখন লাগানো হয়নি, অথচ মাখনের মোড়ক খালি। যেটুকু আছে, তাতে আবার চার আঙুলের স্পষ্ট দাগ। অর্থাৎ চারটে আঙুল দিয়ে দলা দলা মাখন তুলে নিলে যা হয়। খাবারের ডিশ থেকে সামান্য-সামান্য খাবার মুখে দিতে শুরু করলেও, দলা দলা মাখন নিশ্চয়ই কেউ চাখবে না। তাই, লাহিড়ীজেঠুকে একদৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার মনে চট করে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথাটাই আসে। এবং সেটার আংশিক সত্যতা প্রমাণ করছে মাখনের মোড়কটা। পোড়া জায়গায় অনেকসময় মাখনের প্রলেপ লাগানো হয়। আমার ধারণার পুরোটা সত্যি কি না জানবার জন্যেই সাইকেল নিয়ে চট্ করে—"

মিঃ লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি বুঝলেন কী করে যে অভ্র বাচ্চাটার সন্ধানেই গেছে ?"

মিঃ লাহিড়ী মৃদু হাসলেন, "পাঁচটা ইন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে যার অপর নাম ইনট্যুইশান। সেই ইনট্যুইশানের সাহায্যেই বুঝলাম, অভ্র সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছে। এবং অল্পবয়সের চাপল্যের জন্যেই বলো, আর অনুমানটাকে প্রমাণ-নির্ভর করে নিশ্চিত হবার জন্যেই বলো, অভ্র যে হাসপাতালের দিকেই ছুটবে, এ আমি বুঝতেই পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে সেটা বলিনি, পাছে তুমি ছেলের ওপর রাগারাগি করো।"

দরজার আড়াল থেকে অভ্রর মা যে সমস্ত কথা এতক্ষণ শুনছিলেন, তা বোঝা গেল যখন তিনি ঘরে ঢুকেই মন্তব্য করলেন, "তোমরা আর যেখানেই পিকনিক করো না কেন, ও জায়গায় কিন্তু কোরো না। ওটা ভীষণ অলক্ষুনে জায়গা !"

অভ্র বলে উঠল, "কিন্তু চা—চা কোথায় মা ? মাথাটা যে বড্ড ধরেছে !"

"চা নয়, কফি আনছি। তোর কি মনে নেই, মিস্টার লাহিড়ী কফিটাই পছন্দ করেন বেশি ?"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আবার দেখা হয়ে গেল ! এসো, আনন্দ করা যাক্ ।
অ্যালান, আমরা এখানে···
কীভাবে এলে ? বলছি । গর্গনজোলার একটা মালবাহী জাহাজ আমি চালাই । কাল আমাকে বেতারে গতিপথ পালটে এদিকে আসতে বলা হল । যেন হঠাৎ দেখা । বুঝলে ?
বুঝলুম, এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবেন ?
মক্কায় নয় । ওয়াদেসদায় নামিয়ে দেব ।
অ্যাঁ ! সেখানে আমাদের ধরতে পারলেই তো শূলে চাপাবে !
চাপালে চাপাবে ! নাও, এখন খাও তো !
আমাদের মক্কায় নিয়ে যেতে হবে ! নইলে···
নইলে কী ? দ্যাখো, হুজ্জতি করলে সমুদ্রে ফেলে দেব, আর হাঙররা তোমাদের ছিঁড়ে খাবে ! তাই চাও ?
এখন চললুম । রাত্তিরটা ঘুমোও । দাড়িটা কম্বলের তলায় রাখবে, নাকি বাইরে, সেইটে ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ো ।
ও-সব ভাবতে গেলে কি ঘুম হবে ?
এক ফোঁটাও না !
বাইরে রেখে সুবিধে হচ্ছে না তো
ভিতরে রাখলেও অস্বস্তি !
!
খেও না ! খেলেই···
বিপদ ঘটবে
খেয়ে দ্যাখো !
খাব ?
ঝন্ ঝন্

লোহিত সাগরের হাঙর

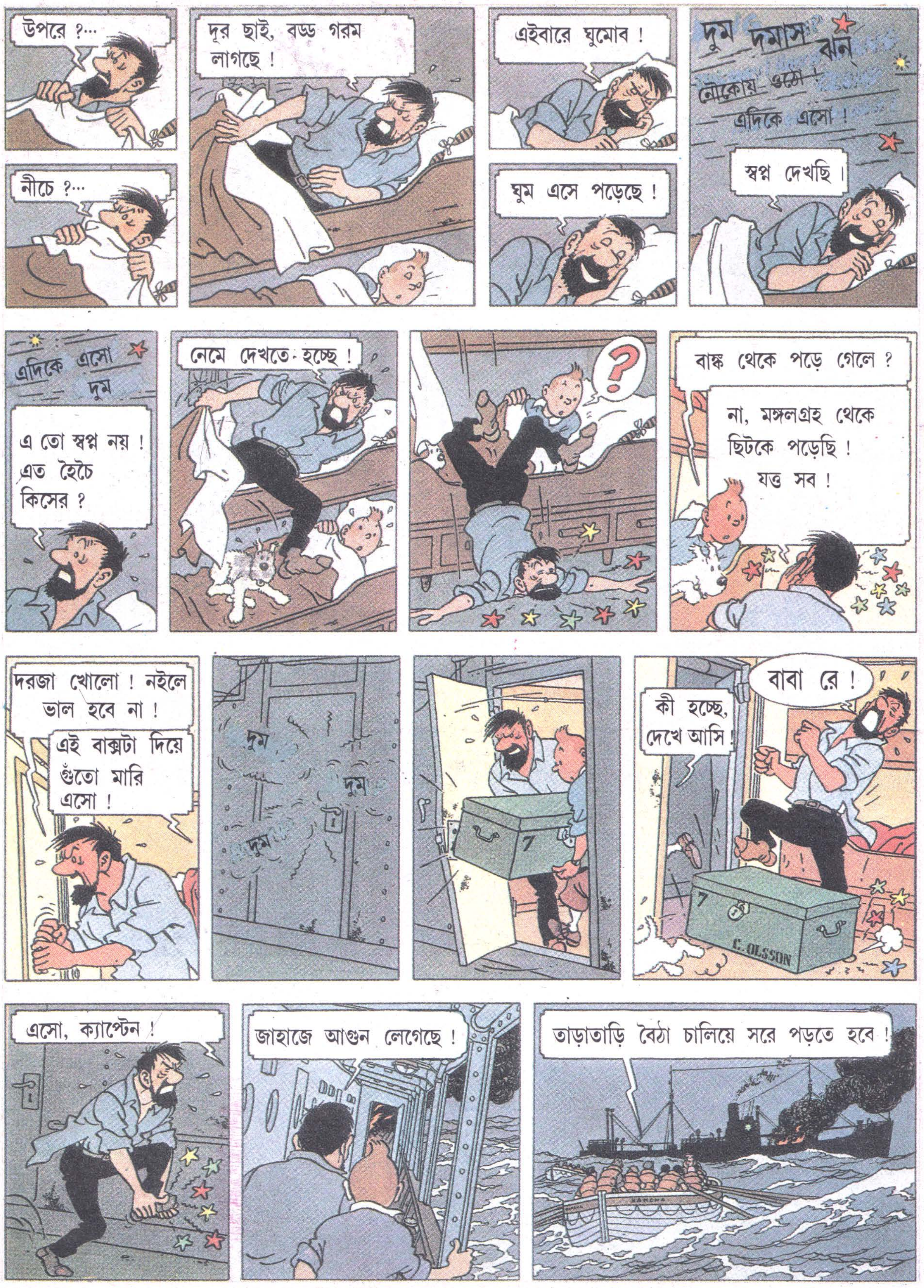

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
রয় আজ মেলবরোর ম্যানেজারের বিদ্রূপের পাত্র
চিরশত্রু মেলবরোর কাছে জিওফ গাইল্‌সকে বেচে দিয়ে রয় আজ রোভার্সের ভক্তদের আস্থা হারিয়েছে। রোভার্সের গোলকিপার চার্লি কার্টারও আগের খেলায় যাচ্ছেতাই খেলেছে। বদলি খেলোয়াড় পেতে হলে বড্ড বেশি দাম দিতে হবে। তাই রোভার্সের জুনিয়র গোলকিপার ওয়াল্টার উইলিয়ামসকেই রয় আজ মেলবরোর বিরুদ্ধে নামাচ্ছে। কে জানে, এর পরিণাম কী হবে!
বাচ্চা ছেলে! বাতাস লাগলে উড়ে যাবে!
চার্লির বদলে ওয়ালিকে নামানোটা পাগলামি!
এসো ওয়ালি!
রোভার্স মাঠে নেমেছে, কিন্তু তেমন-কিছু হাততালি পড়েনি···
ভয় পেও না, ওয়ালি। দু'একটা মোক্ষম গোল বাঁচালেই সবাই তোমার ভক্ত হয়ে যাবে।
চেষ্টা করব, মিঃ রেস!
আর হ্যাঁ, মিস্টার বলবার দরকার নেই। খেলার মাঠে আমাকে 'রয়' বলে ডাকবে।
ঠিক আছে মিঃ রেস···মানে রয়!
হঠাৎ মাঠে বিপুল জয়ধ্বনি····
হুররে জিওফ!
এই যে জিওফ!
ছেড়ে গেলে কেন?
রয়ও জিওফকে দেখে এগিয়ে গেল···
তোমার সাফল্য কামনা করি!
ধন্যবাদ রয়!
জিওফকে ছেড়ে দিয়ে ভাল করোনি, রয়!
মেলবরোর ম্যানেজার অ্যাণ্ডি জ্যাকসন আজ বেজায় খুশি···
রয়, ওরা ঠিকই বলছে! জিওফকে ছেড়ে পস্তাতে হবে!
সর্বনাশ!
দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল রয়ের···
তুমি শেষ হয়ে গেছ!
স্বপ্ন কি সত্যি হতে চলেছে?

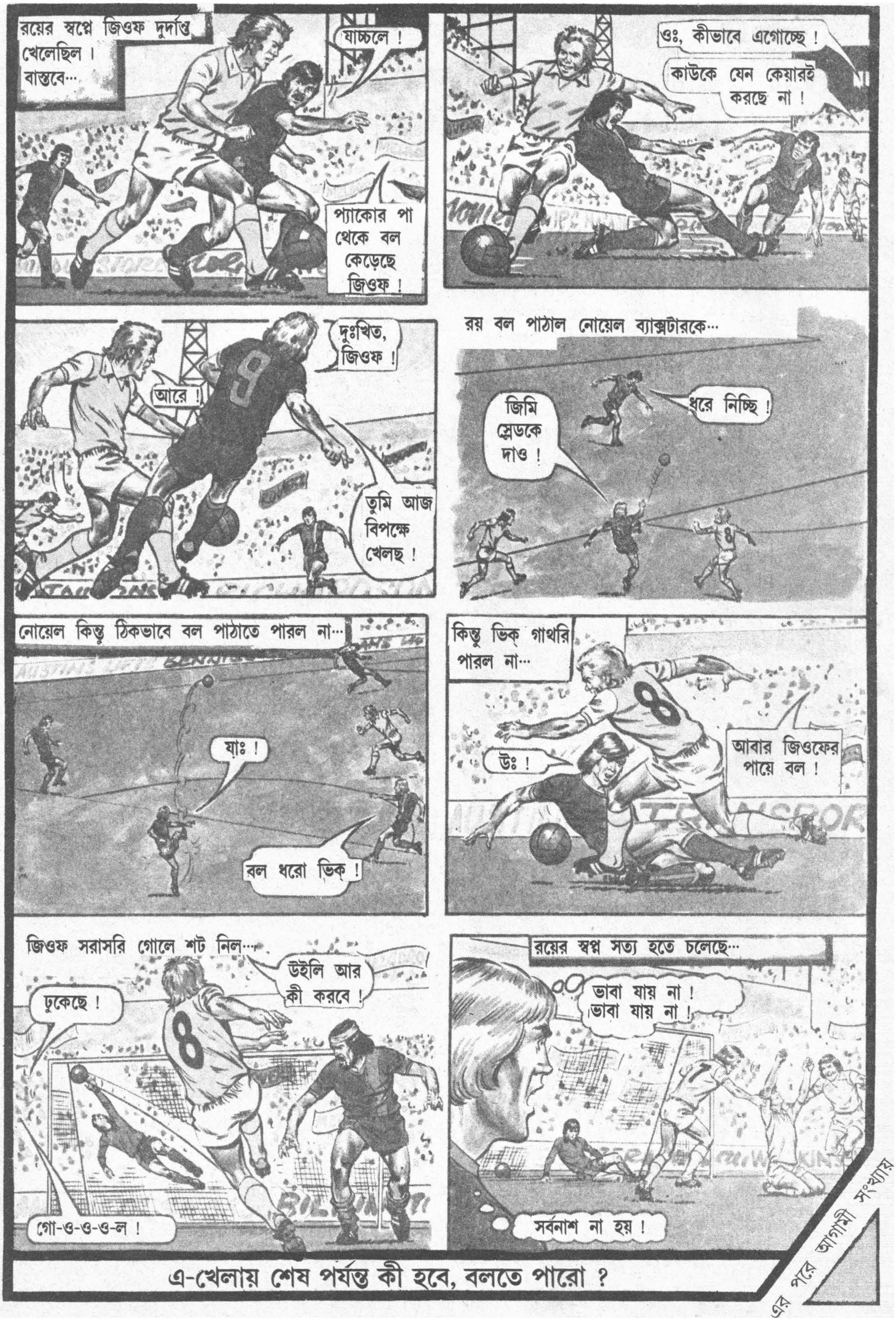
রয়ের স্বপ্নে জিওফ দুর্দান্ত খেলেছিল। বাস্তবে…
যাচ্ছলে !
প্যাকোর পা থেকে বল কেড়েছে জিওফ !
ওঃ, কীভাবে এগোচ্ছে !
কাউকে যেন কেয়ারই করছে না !
দুঃখিত, জিওফ !
আরে !
তুমি আজ বিপক্ষে খেলছ !
রয় বল পাঠাল নোয়েল ব্যাক্সটারকে…
জিমি স্প্রেডকে দাও !
ধরে নিচ্ছি !
নোয়েল কিন্তু ঠিকভাবে বল পাঠাতে পারল না…
যাঃ !
বল ধরো ভিক্ !
কিন্তু ভিক্ গাথরি পারল না…
উঃ !
আবার জিওফের পায়ে বল !
জিওফ সরাসরি গোলে শট নিল…
উইলি আর কী করবে !
ঢুকেছে !
গো-ও-ও-ল !
রয়ের স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে…
ভাবা যায় না ! ভাবা যায় না !
সর্বনাশ না হয় !
এ-খেলায় শেষ পর্যন্ত কী হবে, বলতে পারো ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন?

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন—সূর্য্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ ক'রে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে—আর যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

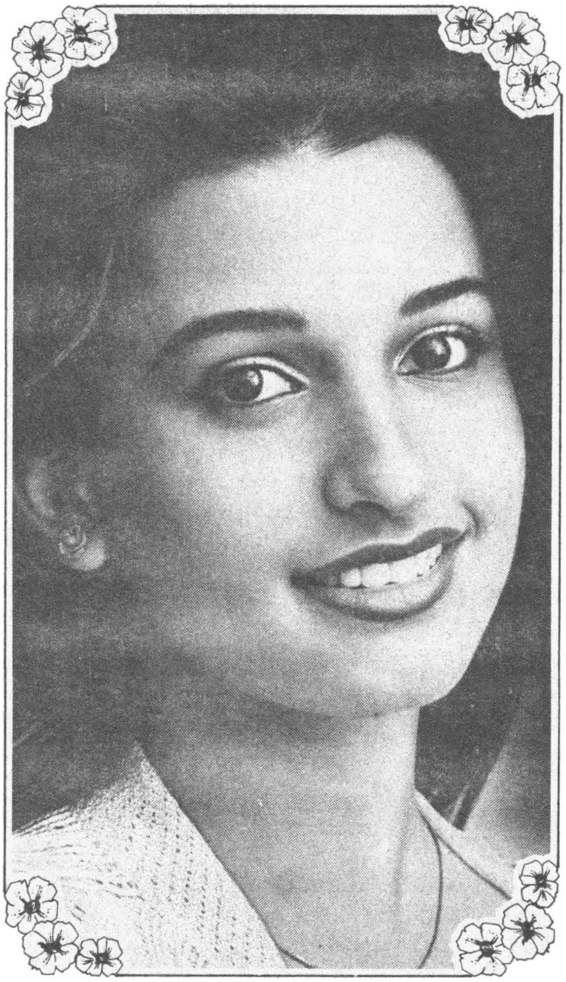

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে?

হ্যাঁ আছে! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার—রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমন কি তা বিপরীত দিকে চালনাও করে। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী! এ হ'ল রঙ ফর্সা করার ক্রীম।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কিভাবে কাজ করে?

২ ভাবেঃ

ত্বকের ভেতরেঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে—আপনাকে এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরেঃ ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লীর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্য্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্সঃ

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কাজ করছে, ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন—আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী
সম্বন্ধে আরোকিছু জানতে হ'লে
এঁর কাছে লিখুনঃ
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং ৭৫৮,
বম্বে ৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী
রঙ ফর্সা করার ক্রীম

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে...প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে!

হিন্দুস্থান লিভারের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS FALOV 37 2416 BG

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : লজেন্স কিনতে গিয়ে হরেনদার ভাগনে নিতুকে দেখল রুকু। নিতুর গায়ে ডোরাকাটা নীল জামা। সুকু ওদিকে অনিলের নাক ফাটিয়েছে, সেই সঙ্গে জানিয়েছে, "পলাশের মাথা ফাটাব।" রুকু-সুকুর বাবা ডাক্তার প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি এসে দুই ছেলেকে নিয়ে স্কুলে চলেছেন। তারপর...

স্কুলের মাঠে একেবারে সার্কাসের মতো তাঁবু পড়েছে। ব্যাণ্ড বাজছে তালে তালে। জনগণমন অধিনায়ক। ঢোকার গেটে একটা তোরণ হয়েছে। ফুল, লতাপাতা, রঙিন কাগজ। পিটার গোমেজ ফুলের স্টল দিয়েছেন। সাদা গোলাপ, লাল গোলাপ, হলদে গোলাপ। কারনেশান, অ্যাস্টার। ছোট-ছোট ঝাউপাতা আর চকচকে জরি দিয়ে বাঁধা। এ বেশ ভাল। চায়ের দোকান, চাটের দোকানের চেয়ে এ বেশ ভাল। কেবল খাওয়া-খাওয়া। ভালও লাগে বাবা মানুষের। গোমেজসায়েবের ফুলের দোকানে বাবাকে সাহায্য করার জন্যে এসেছে মেয়ে লিলি। ফুলের মতো ছোট্ট মেয়ে। হালকা হলুদ রঙের পোশাক পরে প্রজাপতির মতো উড়ছে যেন।

ডক্টর মুখার্জি ফুল কিনলেন। আরও কিনলেন গোমেজকে সাহায্য করার জন্যে। গোমেজ খুব ভালমানুষ। একসময় ভীষণ ভাল চাকরি করতেন। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকেই অবস্থা নামতে নামতে খুব নেমে গেছে। শেষে গত কয়েক বছর হল একটা নার্সারি করেছেন। উঃ, কী ফুলই না ফুটছে সেখানে!

ওধারে একটা বইয়ের স্টল হয়েছে। ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, প্রাকৃতিক চিকিৎসার বই বিক্রি হচ্ছে। বাবা, মা, রুকু, সুকু যেন মার্চ করে প্যাণ্ডেলে গিয়ে ঢুকল। হেডমাস্টার নিজে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। একেবারে সামনের সারিতে বসার জায়গা হল। সামনেই ডায়াস। সাদা ধপধপে চাদর মোড়া। পেছনের কাপড়ে থার্মোকল কেটে ব্যায়ামবীরের মূর্তি করে আটকে দেওয়া হয়েছে। হাঁটু আধ-মোড়া করে বসে হাতের মাস্‌ল দেখাচ্ছে।

সুকু উসখুস করছে। একেবারে পেছনের সারিতে ধারের দিকে বসে আছে নিতু। সব ঠিক আছে। গায়ে সেই নীল ডোরাকাটা জামা। একটাই বেঠিক। মাথাটা ন্যাড়া। কোথায় গেল অমন সুন্দর চুল! রহস্যটা জানার জন্যে সুকু উসখুস করছে। সাহস করে উঠে যেতে পারছে না। বাবা বকবেন। বলবেন, 'ছটফট করছিস কেন।'

রুকু কিন্তু নিতুকে দেখতে পায়নি। সে হাঁ করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে। কত কী যে হচ্ছে সেখানে। আলো ঠিক করা হচ্ছে। একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে ফোকাস মারা হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। সুকুর চোখ চলে গেল ডান দিকের কোণের আসনে। অনিল আর পলাশ বসে আছে পাশাপাশি। অনিলের নাকে বিশাল এক ব্যাণ্ডেজ। পলাশ মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে এদিকে। মাঝে-মাঝে ফিসফিস করে অনিলের কানে-কানে কিছু বলছে। কী মতলব আঁটছে কে জানে!

স্টেজে এক-একবার এক-একজন আসছেন, কীসব করছেন আর রুকু আপন মনে 'ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল' বলে বলে উঠছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ডক্টর মুখার্জিকে এক-একবার এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসন থেকে উঠে এসে জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন আছেন।' কেমন আছেন শোনার আগেই সাতকাহন করে নিজেদের শরীরের কথা শুরু করছেন। বাপ রে বাপ! কত রোগ যে মানুষের! কারও সকাল-সন্ধে নাক বুজে যাচ্ছে। কারও ঘাড়ে বিকট ব্যথা। পেটেরই কত রকম গোলযোগ! ঢ্যাপ-ঢ্যাপ করছে। কারও নিরেট হয়ে আছে। কারও ছলকে উঠছে। সকলকেই ডক্টর মুখার্জি নরম গলায় বলছেন, "পরিশ্রম করুন, পরিশ্রম। শ্রমের বিকল্প কিছু নেই।" আর সেই কথা শুনে সকলেই বলছেন, "দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট। পরিশ্রমই একমাত্র মেডিসিন।"

সুকু এক ফাঁকে বাবাকে প্রশ্ন করল, "তুমি বিরক্ত হচ্ছ না কেন বাবা?"

"বিরক্ত! বিরক্ত কেন হব সুকু। সামান্য দু-চার কথা বললে মানুষকে যখন সন্তুষ্ট করা যায় তখন কৃপণ হব কেন?"

হঠাৎ দপ করে সব আলো নিভে গেল, জ্বলতে লাগল শুধু স্টেজের আলো। আলোয় আলোয় ঝলমলে। রুকু আর সুকু রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। আর ওইরকম অবস্থাতেও অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি ডক্টর মুখার্জির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, "ডাক্তারবাবু, ঘনঘন হাঁচির কোনও ওষুধ আছে?"

ডক্টর মুখার্জি ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, আছে। হাঁচির দিক থেকে মনটা সরিয়ে রাখুন। অনুষ্ঠান দেখুন।"

ছায়ামূর্তি সরে গিয়ে দূরের আসনে ঝুপ করে বসে পড়ল।

সুকু বললে, "বাবা, বাড়িতে তুমি যেমন ইন অ্যাণ্ড আউট লিখে রাখো, এখানেওসেইরকম একটা কিছু চালু করো না।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আপাতত আমি আউট। ডক্টর ইজ নট ইন হিজ চেম্বার।"

উইংসের পাশ থেকে ডিগবাজি খেতে-খেতে একটি মেয়ে স্টেজের একেবারে মাঝখানে এসে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। পরক্ষণেই উলটো ডিগবাজি খেতে-খেতে উইংসের পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কী হাততালি। অন্ধকার থেকে সিক্‌ করে কে যেন সিটি বাজাল।

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "সিটি! সিটি কে বাজালে! এ যে দেখি বাজারের অনুষ্ঠান হয়ে গেল! গোটাকতক অসভ্য এসে জুটেছে!"

সুকু জানে সিটি কে দিয়েছে! পলাশ। পলাশ ছাড়া কে দেবে!

মঞ্চে হেডমাস্টারমশাই এসে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "আমার প্রিয় ছাত্র ও সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, অনুষ্ঠানের পবিত্রতা বজায় রাখুন। দিস ইজ এ স্কুল, এ ডিসটিনগুইশড স্কুল অব দি ডিসট্রিক্ট। দি স্যাংটিটি অব দিস সেক্রেড ইনস্টিটিউশান মাস্ট বি প্রিজারভড বাই এনি মিন্স। আমার কোনও ছাত্র যদি অসভ্যতা করে থাকে, ফাইণ্ড হিম, স্পট হিম আউট, থ্রো হিম আউট। সেই ইডিয়েটটাকে বের করে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতেই, সুন্দর চেহারার সাত-আটটি ছেলে সাদা পোশাক পরে মঞ্চে গোল হয়ে দাঁড়াল। সবার শেষে ঢুকলেন ব্যায়ামবীর কমল ভৌমিক। ঠিক যেন টারজানের মতো দেখতে। লম্বা-চওড়া। অসাধারণ একজন মানুষ। তিনি ঢুকেই নমস্কার করে বললেন, "আপনারা ইজিপ্টের পিরামিডের নাম শুনেছেন। অনেকে হয়তো দেখেছেনও, এখন দেখবেন হিউম্যান পিরামিড। এ স্পেক্‌টাকুলার অ্যাণ্ড ফ্যানটাসটিক হিউম্যান ফিট।"

পকেট থেকে বাঁশি বের করে বিপ্ করে বাজালেন। আর মার্চ করে আরও দশ-বারোটি ছেলে মঞ্চে প্রবেশ করল। বিপ্ করে আবার বাঁশি। সঙ্গে-সঙ্গে তারা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরছে, ঘুরছে। গোল হয়ে ঘুরছে। কমল ভৌমিক তালি বাজিয়ে আচমকা বলে উঠলেন, "রেডি।"

আর সঙ্গে-সঙ্গে চোখের সামনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ছেলেরা যে যেখান থেকে পারল সামারসল্ট খেতে-খেতে, একের ওপর আর এক, তার ওপর আর এক চুড়ো হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। নিখুঁত পিরামিডের আকৃতি। সেই অবস্থায় তারা বেশ কিছুক্ষণ রইল। তারপর কমল ভৌমিক যেই বাঁশি বাজালেন, সকলে কবিতার ছন্দের মতো খুলে-খুলে পড়ে গেল। পড়ার মধ্যেও কী আর্ট!

চটাপট্, চটাপট্ প্রবল হাততালি। হাততালি থামতে-না-থামতেই সিক্-সিক্ দু'বার সিটি। রুকু আর সুকু দু'জনেই চমকে উঠল। অন্ধকার হলেও সুকু পলাশের দিকে

চোখ রেখেছিল। মঞ্চের আলোয় ঘন কালো পলাশের ছায়ামূর্তি সিটি দেবার দমকে স্পষ্ট দু'বার দুলে উঠল।

উইংসের পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন হেডমাস্টারমশাই। মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জলদগম্ভীর মুখ। ভারী গলায় বললেন, "আমি দুঃখের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। দিস গোজ এগেনস্ট আওয়ার ডিসিপ্লিন।"

দর্শকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল।

হেডমাস্টারমশাই আরও কিছু যোগ করলেন, "আমাদের এই এতদিনের নিষ্কলঙ্ক প্রতিষ্ঠানে যারা কলঙ্ক লেপন করে সুখী হতে চায়, তাদের সুখ আমি আর বৃদ্ধি করতে চাই না। আমাদের মাননীয়, সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন তাঁর সুশিক্ষিত দল নিয়ে কত কী দেখাতে, সে সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। কী আর করা যাবে। আমাদের ভাগ্য। কমলবাবুর কাছে আমি আপনাদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিচ্ছি।"

হেডমাস্টারমশাই শেষ করা মাত্রই আলোআঁধারে পলাশ উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বললে, "আমি জানি স্যার, কে সিটি মেরেছে।"

"কে সে! জানোই যদি, তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে।"

পলাশ কী করছে, কাকে ধরছে, স্পষ্ট দেখা না গেলেও, সুকুর মনে হল, সে নিতুর দিকে যাচ্ছে। আসার সময় সুকু দেখেছে নিতু পলাশ যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকেই বসে আছে। সুকু চাপা গলায় রুকুকে বললে, "দেখেছিস দাদা, শয়তানটা নিতুকে ধরতে যাচ্ছে।"

রুকু আর সুকু ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। ঠিক তাই। পলাশ নিতুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মঞ্চের দিকে নিয়ে চলেছে। নিতুর মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই। পলাশের টানে টাল খেতে-খেতে চলেছে। রুকু, বাবা, মা কিছু বোঝার আগেই সুকু চিতাবাঘের মতো পলাশের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও একটা ঝটাপটি হচ্ছে। গোটাকতক ঘুষির শব্দ কানে এল। পরক্ষণেই পলাশের আর্তনাদ, "বাবা রে!"

ততক্ষণে রুকু আর ডাক্তার মুখার্জি ছুটে গেছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন মা রাজ্যেশ্বরী। হেডমাস্টারমশাই মাইকে চিৎকার করে বলছেন, "কী হল? হল কী, আরে হচ্ছেটা কী?"

যা হচ্ছে তা এই রকম, পলাশ পড়ে আছে ঘাসের ওপর, আর সুকু নিতুকে নিয়ে সোজা মঞ্চে। ফটফটে আলোয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুকু আর ন্যাড়ামাথা নিতু। গায়ে সেই অদ্ভুত ডোরাকাটা জামা।

ডক্তর মুখার্জি হাত ধরে পলাশকে মাটি থেকে তুলছেন, আর হেডমাস্টারমশাই সুকুকে প্রশ্ন করছেন, "আরে সুকু, তুমি! তুমিই অন্ধকার থেকে চিৎকার করছিলে! এই সেই ছেলে!"

সুকু সবে বলেছে, "না, স্যার।"

পলাশ ডাক্তার মুখার্জির হাত ছাড়িয়ে এক লাফে মঞ্চে। সুকু কিছু বোঝার আগেই তার নাকে আচমকা এক ঘুষি। সুকু টলে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল। সাহায্য করল নিতু।

হেডমাস্টারমশাই বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন।

সুকুর বাবা অন্ধকারে মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না। রুকু প্রায় উঠে পড়েছে। আর সুকু ?

আচমকা ঘুষি খেয়ে সুকু একেবারে হিংস্র বাঘ। জমি থেকে প্রায় হাতখানেক লাফিয়ে উঠে পলাশের চোয়ালে শিক্ষিত হাতের এক প্রচণ্ড ঘুষি। পলাশ টাল খেয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের পায়ের কছে একেবারে চিতপটাং।

কমল ভৌমিক গোলমাল শুনে মঞ্চে সবে এসে ঢুকেছেন। তিনি বলে উঠলেন, "ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, এ ডিসেন্ট আপারকাট।"

সুকুর নাক দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত নেমে এসেছে। ঠোঁটে। চিবুকে। পলাশ দুমড়ে মুচড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কমল ভৌমিক বকসিং-এর রিংমাস্টারের কায়দায় গুনে চলেছেন, "ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।" টেন গোনার সঙ্গে-সঙ্গে পলাশ ধপাস করে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। কমলবাবু বললেন, "আউট। ইউ আর দি উইনার।"

সুকু বললে, "স্যার, এই সেই ছেলে, যে সিটি দিচ্ছিল।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "এই ছেলেটি কে ?"

"এর নাম নিতু। কয়েক দিন হল এখানে এসেছে।"

"একে মঞ্চে তুললে কেন ?"

"আমি তুলিনি স্যার। পলাশ একে ধরে আনছিল। ভাল, নিরীহ, নতুন ছেলেটাকে মার খাওয়াবে বলে। এ আমাদের হরেনদার ভাগনে। হরেনদার দোকানে বসে। আজও বসেছিল সকালে। এমন সময় এই পলাশ আর অনিল গিয়ে, ভালমানুষ দেখে, এক জার ক্রিম বিস্কুট জোর করে খেয়ে নিয়েছে। এক জার লজেন্স পকেটে পুরে পালিয়ে এসেছে।"

কমলবাবু আর ডাক্তারবাবু দু'জনে মিলে পলাশকে ধরে বসিয়েছেন। মাথাটা ঝুলে আছে বুকের কাছে। নড়নড় করছে। নিজের ছেলের দিকে একবারও না তাকিয়ে ডাক্তারবাবু পলাশকেই চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন।

এমন সময় বিদঘুটে চেহারার, দৈত্যের মতো এক ভদ্রলোক ধীরে-ধীরে দর্শকের আসন থেকে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। ইনি হলেন পলাশের বাবা। ভদ্রলোকের প্রচুর পয়সা। মাইকা, লাইমস্টোন, আরও কী কী সব জিনিসের ব্যবসা করেন। দু-তিনখানা বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। তেএঁটে স্বভাবের মানুষ। অহঙ্কারে মটমট করেন। কথায়-কথায় যাকে-তাকে চড়চাপড় চালান। সবাই জানে লোকটি তেমন সুবিধের নয়।

মঞ্চের সামনে এসে হেঁড়ে গলায় বললেন, "হেডমাস্টারমশাই, আপনার পুলিশ ডাকা উচিত।"

সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে কে একজন বললেন, "এই যে, আমরা আপনার পেছনেই আছি।" এতক্ষণ সবাই মঞ্চের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। লক্ষ করেননি কেউ। কখন সদর থানার অফিসার-ইন-চার্জ দলবল নিয়ে চলে এসেছেন।

"দেখি মহাশয়, হাত দুটো দেখি।" কটাং-কটাং করে আওয়াজ হল দু'বার। অফিসার হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

কমলবাবু বললেন, "হেডমাস্টার স্যার। আমরা আর কী খেলা দেখাব, বাইরের খেলা তো আরও বেশি জমেছে। ব্যাপারটা কী ? কী হচ্ছে এসব।" (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

জ্যোৎস্না রাতের মানে

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এই যে দাদা, করেন কী যে,
রাত দুপুরে ছাতের উপর নিজে নিজে ?

কী আর করি, ঘুম আসে না, তাই তো ছাতে
ঘুরতে ফিরতে দেখতে শুনতে জ্যোৎস্না রাতে
ভালই লাগে ; তাকিয়ে থাকি চাঁদের পানে,
খুঁজতে থাকি জ্যোৎস্না রাতের আসল মানে !

জ্যোৎস্না রাতের আসল মানে ক'জন জানে,
ক'জন বলো এমনি জাগে চাঁদের টানে ?
জ্যোৎস্না রাতের অনেক ব্যাপার, চাঁদের বুড়ি
হাত নাড়ালেই চতুর্দিকটা স্বপ্নপুরী !
হালকা মেঘের পলকা হাওয়ায় সোনার জরি
ছড়িয়ে গেলে পাখনা মেলে সে কোন্ পরি !
চাঁদনি রাতে পক্ষিরাজে তখন সওয়ার
আর কে বলো, টগবগিয়ে ডালিমকুমার।
কোথায় যে যায় তাই তো রাতে জেগে দেখা,
জ্যোৎস্না রাতে সব দেখা যায়, জাগলে একা
আর দেখা যায় রাজার বাড়ি মস্ত বেজায়,
এক সাহসী বুক ফুলিয়ে সেই দিকে যায় ;
আওয়াজ ভাসে নিঝুম রাতে রাক্ষসীদের
হালুম হালুম আস্ত খাবে পায় যদি টের !
তারই মধ্যে সেই সাহসী ছিনিয়ে আনে
এক রূপসী ফুলকুমারী, জ্যোৎস্না-টানে।
ফুল ফোটে সব সোনা-রুপোর খিলখিলিয়ে,
তাই না দেখে মন ভরে যায় সব মিলিয়ে।
জ্যোৎস্না রাতের অনেক মানে অনেকরকম
শুকসারি সব যখন করে বকমবকম।
পলক ফেলতে জ্যোৎস্না রাতটা এক-এক সুরে
আকাশজোড়া অবাক ব্যাপার কাছে দূরে,
চাঁদনি রাতের কী যে মায়া, কী যে মানে,
কোন্ অভিধান লিখেছে তা ? ক'জন জানে ?

ছবি : দেবাশিস দেব

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ

শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ ঃ সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ ঃ সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ ঃ সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো—চট্‌পট্‌ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন ঃ সেরেল্যাক
পোষ্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮

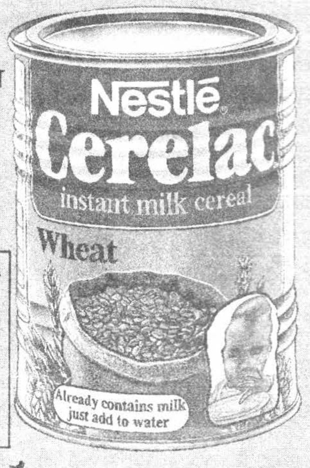

Nestlé

SAA/FSL/C/3799 (R) BEN

সেরেল্যাকের যত্ন ঃ পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অনন্য

অরবিন্দর পিসিমা

রানা চট্টোপাধ্যায়

আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বলি শোনো। সত্যি ঘটনা, এতটুকু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলছি না। এখনও ভাবলে গা ছমছম করে ওঠে। সময়টা গরমকাল। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। আমার বাবার এক বন্ধু ছিলেন রমণীমোহন পাল। থাকতেন গড়িয়ায়। স্টেশনের ওপারে খোলাপোতা না পাঁচপোতা নামের একটা গ্রামে। স্টেশন থেকে নেমে পাক্কা চল্লিশ মিনিট লাগত হেঁটে যেতে।

রমণীকাকার ছোট ছেলে অরবিন্দ ছিল আমার বয়সী। আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই ওদের গ্রামের বাড়িতে আমরা যেতুম। এখন ওদিকটা গেলে ভাবতেই পারা যায় না, কীরকম ফাঁকা, প্রায় জনমানবহীন জায়গা ছিল। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছরে কতখানি পরিবর্তন না ঘটে গেছে!

সে-সময় বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে কয়লার ইঞ্জিনের ট্রেনে চেপে অনেকক্ষণ লাগত গড়িয়া পৌঁছতে। যাকগে, যে গল্প করছিলাম, একদিন অরবিন্দ এসে আমার বাবা-মাকে বলল, "ক'দিন ছুটি আছে, মা বলছিল যদি ও যায়, খুব হৈ-চৈ করা যাবে। গাছে নতুন আম হয়েছে।"

বাবা বললেন, "বাধা দেব না, পড়াশুনোর ক্ষতি হলে আমি কিন্তু—"

অরবিন্দর সঙ্গে আমি গড়িয়ায় চলেছি। বাবা বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিলেন এবং অরবিন্দকে বললেন, যেন সাবধানে যাই। ট্রেন থেকে ঠিকমতো নামি-উঠি। অরবিন্দ হয়তো আমার থেকে দু-এক বছরের বড় ছিল, তাই গম্ভীর ভাবে বাবাকে বলেও দিল, "কাকা, কোনও চিন্তা নেই। আজ মঙ্গলবার, শুক্রবার বিকেলে আমি পৌঁছে দিয়ে যাব।" বাবা পাঁচ-সাতটা টাকাও সঙ্গে দিয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল আমি যেন অনেক দূরে কোথায় যাচ্ছি।

যাই হোক, বিকেলবেলায় ট্রেনে চেপেছি। গড়িয়া স্টেশনে পৌঁছলাম সঙ্গে-সঙ্গে। কোথাও ইলেকট্রিক আলো নেই। অরবিন্দ স্টেশনে নেমে কিছু বাজারটাজারও করল এবং খুব শস্তা যাচ্ছে দেখে একটা বড় ইলিশমাছ কিনে নিল। বাজারের থলি আমার হাতে, ইলিশের নাকে দড়ি বেঁধে ও ঝুলিয়ে নিয়েছে। ওর চেনা পথ, কিন্তু আমার তো নয়, তাই মাঝে-মাঝেই অন্ধকারে হোঁচট খাচ্ছি। বাজারের আলোর রেশ মিলিয়ে যেতেই শুধু আলপথ এবং মাঝে-মাঝে বেঁটে-বেঁটে খেজুরগাছ।

আগেই বলেছি অরবিন্দদের বাড়ি স্টেশন থেকে পাক্কা চল্লিশ মিনিট লাগে। এই চল্লিশ মিনিট শুধু ধানখেত আর ধানখেত। বাড়িটাড়ি নেই বললেই চলে, কারণ গ্রাম সেই গিয়ে খোলাপোতা! সেখানে আট-দশ ঘর লোকের বাস। তারপর আবার ফাঁকা, হাঁটতে-হাঁটতে গেলে কালিকাপুর যাওয়া যায়। এই পথে লোকজন কমই থাকত, সন্ধের পরে তো নয়ই। দু-একজন কলকাতায় চাকরি করতে যেত, তারা সাইকেল করে ফিরত। কারণ হাঁটাপথ একটু বিপজ্জনকও বটে। গরমকালে এখানে সাপ-খোপও বার হত। মিনিট দশেক পরে অরবিন্দ বলল, "দাঁড়াও, হাত বদল করে নিই। তুমি মাছটা ধরো আমি বাজারের থলি। আর শোনো, পিছন ফিরো না।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তবু মনে হল অরবিন্দ একটু ঘাবড়েই এই কথাগুলো বলল। আমি ভালমানুষের মতো মুখ করে বললাম, "কেন?"

অরবিন্দ তখন যা বলল, তাতে আমারও বুকটা ঢিবঢিব্ করতে লাগল। একে অমাবস্যা, তায় আবার মঙ্গলবার। মেছো-ভূতপেত্নি আশপাশে ঘুরঘুর করছে। ক'দিন আগেই ফেলুচোরের চাচা হারানখুড়োর কাছে মাছ চেয়েছিল। হারানখুড়ো মাছ দেয়নি, ব্যস, সামনের খেজুরগাছ হঠাৎ রাস্তায় শুয়ে পড়ল। হারানখুড়ো মাছটা ফেলে না দিয়ে যেই খেজুরগাছটা ডিঙিয়ে ওপারে যাবে ভেবেছে, গাছও খুড়োকে

নিয়ে উঠে গেছে। আর খেজুরগাছের মাথায় হারানখুড়োকে কাপড় জড়ানো, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া গেছে, হাতে ধরা একটা সরপুঁটিমাছ। যদিও এই গল্প শুনে আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তবু কলকাতার ছেলে হিসেবে সাহস দেখাতে কম যাই না। বললাম, "যত সব গাল-গল্প। ভূত-পেত্নি মনের ভুল। তা ছাড়া রমণীকাকার কাছে শুনেছি, ফেলুচোর সম্পত্তির জন্য খুড়োকে মেরে ফেলে ওই খেজুরগাছে টাঙিয়ে রেখে এসব গপ্পো ছড়াচ্ছে।"

অরবিন্দর হাত থেকে মাছটা নিয়েছি এবং তারপর থেকেই মনে হচ্ছে ওই সামনের খেজুরগাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষুনি হয়তো গল্পে পড়া কোনও শাঁকচুন্নি তার লম্বা হাত বার করে মাছ চাইবে, "দেঁ না, মাঁচ দেঁ নাঁ।"

অরবিন্দকে বললাম, "তোমরা এত ভিতু কেন? গ্রামের ছেলেরা শুনেছি খুব সাহসী হয়। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমরা অনেক বেশি সাহসী। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই, ধু-ধু ধানখেত, এর মধ্যে ভূত-পেত্নি আসবে কোত্থেকে? থাকলে ওদেরই ক্ষতি, ভয় দেখাবে কাকে?"

অরবিন্দ হাসল। বলল, "অত সাহস দেখিও না। ভূত-প্রেত দত্যি-দানো সব সত্যি। নইলে পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, শহর নেই, যেখানে ভূতের গল্প হয় না। এখন ওদের নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। আগে বাড়ি যাই, হ্যারিকেনের আলোয় বাবার কাছ থেকে বরিশালের গাজিসাহেবের মামদো ভূতের গল্প শুনো।"

আমি বললাম না কিছু। অরবিন্দ তখনও বিড়বিড় করছে, "মাছটা না কিনলেই ভাল হত। আধ-সের মাংস নিলেই হত। মা তাই বলেছিলেন। সন্ধে হয়ে যাবে বুঝিনি। ভালয় ভালয় পথটুকু পেরোতে পারলে হয়। তুমি বামুনের ছেলে, সবে একবছর পৈতে হয়েছে, তোমাকে ওরা কিছু করবে না।" এইটুকু মাত্র বলেছে, তারপর অরবিন্দ "আঁ-আঁ" করে উঠল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আছি। ও আমার কাছে সরে এসে বাঁ হাতটা সজোরে চেপে বলছে, "ওই যে হারানখুড়ো।"

আমি চারদিকে তাকালাম। একটা বেঁটে খেজুরগাছের মাথায় কলাগাছের বড় পাতা হাওয়ায় দুলছে। কেউ কোথাও নেই, ধ্যুস্, অরবিন্দ কী সব যা-তা বকছে। অরবিন্দ কিন্তু তখন ভয়ে কাঁপছে আর বলছে, "রাম-রাম-রাম।"

এই সময় হঠাৎ আমার পায়ে ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলাম। আমি লাফিয়ে উঠেছি, না, একটা সোনাব্যাঙ লাফ দিয়েছে।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছে। আমি কি পারি? ও রোগা, আমি বেশ নাদুসনুদুস। ইলিশমাছ দুলছে, আর ও তখনও বিড়বিড় করছে, "খুড়ো, আমি কিছু করিনি, তুমি ফেলুচোরকে ভয় দেখাও। ও পাজি, আমাদের বাড়িতেও সিঁদ কেটেছিল।"

এইভাবে আরও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট প্রায় দৌড়ে-দৌড়ে চলেছি। তারপর একটা বাঁশঝাড়, প্রায় পনেরো বিঘার বাঁশবন পেরোতে পারলেই খোলাপোতা গ্রামের সীমানা। মুদির দোকান আছে। গোপাল সাহার দোকান। আলো আছে। বাঁশবনের গা ঘেঁষে যেতে হবে। এমনি দিনের বেলাতেই এর পাশ দিয়ে যেতে ভয়-ভয় করে, আজ ভরসন্ধে। তার ওপর অরবিন্দর আজেবাজে গল্প শুনে কেমন যেন আমার বুকটাও হিম হয়ে আছে। পা আর সরছে না। আর ঠিক সেই সময় দেখি, থানকাপড় জড়ানো এক মহিলা, শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। আমাদের ঠিক সামনে এসে পড়েছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মহিলা খিক-খিক করে হেসে বললেন, "কে যায়, রমণীর ছোট ছেলে না? ইটি কে?"

অরবিন্দ "হ্যাঁ" বলে আমার দিকে তাকাল। তারপর মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কোথায় যান পিসিমা?"

"গড়ে ইস্টিশনে।"

"আপনার শুনলাম, খুব অসুখ হয়েছে। কবে ভাল হলেন?"

মহিলা আবার খিক-খিক করে হেসে বললেন, "ভাল হয়েছি? তা, ঘন্টাদুয়েক হবে হয়তো। এখন খুব ভাল বোধ করছি। তোরা যা, সাবধানে যা, ইটি কে? বললি না তো…ও, রমণীর বন্ধুর ছেলে, ইলিশমাছ কিনেছিস? বামুনের ছেলে কিনা," খিক-খিক করে মহিলা হাসলেন।

অরবিন্দ বলল, "যাই পিসিমা।"

মহিলা ঘাড় নাড়লেন। আমরা মহিলাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছি। হঠাৎ এমনিই পিছন ফিরেছি, মহিলা কতদূর যান দেখতে, কোথাও কেউ নেই। কর্পূরের মতন উবে গেলেন নাকি অরবিন্দর গ্রামের পিসিমা?

আমি আর অরবিন্দ এসব ভাবছি, অরবিন্দ বলল, "বুড়ি আমাদের থেকে তাড়াতাড়ি হাঁটে, দেখলি? যাক বাবা, বনটা পেরিয়েছি, ওই যে সাহাদের মুদির দোকান।"

আমিও যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছি। সত্যিকথা বলতে কী, রাস্তায় অরবিন্দর ভূতের গল্প, হঠাৎ আঁ-আঁ করা, এবং বাঁশবনের কাছাকাছি থানকাপড়ে প্রায় আপাদমস্তক জড়ানো পিসিমাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যাক বাবা। বললাম, "কাকিমাকে বলব, ইলিশমাছের তেল রাখতে, কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেতে যা লাগে না।"

এই সময় খোলাপোতা গ্রাম থেকে কয়েকজন লণ্ঠন হাতে এদিকেই আসছিল। "বলো হরি, হরিবোল।"

অরবিন্দ বলল, "কে গেল?"

আমরা শবযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়েছি। অরবিন্দ একজন শববাহককে জিজ্ঞেস করতেই আমি থ হয়ে গেছি। সে কী রে বাবা!

"চিত্তদা, কে গেলেন?"

"পিসিমা।"

"পিসিমা? একটু আগেই যে তাঁকে দেখলাম বাঁশবনের ওদিকে, কথা বললেন।"

তাঁরা হো-হো করে হেসে বললেন, "অরবিন্দ, তুই কী বলছিস? আমরা পিসিমার মড়া নিয়ে যাচ্ছি, বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবি?"

তাঁরা খাটিয়াটা নামাতেই আমি হাত থেকে মাছটা ফেলে দিলাম রাস্তায়। সত্যিই তো, সেই মহিলাই, যাঁকে একটু আগেই দেখেছি। গা ছমছম করে উঠল। আজ দীর্ঘ চব্বিশ-পঁচিশ বছর পরেও মনে হয়, যাঁকে দেখেছিলাম তিনি কী সত্যিই অরবিন্দর গ্রামের পিসিমা ছিলেন? কী জানি। হয়তো…

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে ছেলেদের জন্য যে-ক'টি নামী স্কুল আছে, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিশন তাদেরই মধ্যে একটি। ১৯৮বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের উপর অবস্থিত এই স্কুলটির সূচনা ১৯৪০ সালে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভাবধারা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদের শিক্ষাব্রতী শরদিন্দু বিশ্বাস এই স্কলটির প্রতিষ্ঠা করেন। শরদিন্দুবাবু ছাড়া সূর্যকুমার চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান প্রমুখ আরও কয়েকজন দেশপ্রাণ-অনুরাগীর নাম পাওয়া যায় বিদ্যালয়ের পুরনো কাগজপত্রে, যাঁরা বিদ্যালয়টিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। একেবারে গোড়ার দিকে স্কুলটির মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল নগণ্য, আনুমানিক পনেরো-কুড়ি জন। স্কুলের নিজস্ব কোনও বাড়ি ছিল না, ভাড়া-বাড়িতে ক্লাস হত। ছাত্রদের মাইনে ছিল খুব সামান্য। প্রধান শিক্ষকের মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকার মধ্যে, সহকারী শিক্ষকরা পেতেন পাঁচ টাকা। যোগ্যতা অনুসারে কেউ কেউ অবশ্য মাসে দশ টাকাও পেতেন। প্রথম প্রধানশিক্ষক ছিলেন শরদিন্দু বিশ্বাস।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৬০০। এই স্কুলের বহু ছাত্র ভবিষ্যৎ-জীবনে সুখ্যাত হয়েছেন। সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী সুনীল দাস, বিজ্ঞানী ডঃ সৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, খেলোয়াড় প্রশান্ত ব্যানার্জি ও দীপক দাস, কবি রত্নেশ্বর হাজরা, সাহিত্যিক বলরাম বসাক, সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ও সঞ্জীবকান্তি গুহরাজ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০। পাশ করেছিল ৪৮ জন ছাত্র। প্রথম বিভাগ ৫, দ্বিতীয় বিভাগ ২৫, তৃতীয় বিভাগ ১৭। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষার্থী ৫২ জন। প্রথম বিভাগ ৫, দ্বিতীয় ৩৪, তৃতীয় ১০। গতবারে পরীক্ষা দিয়েছিল ৫১ জন, পাশ করেছিল ৪৮ জন। প্রথম বিভাগ ৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ২৯, তৃতীয় বিভাগ ১৪। **এই স্কুলের ছাত্র সৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ১৯৬৪ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন।**

স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকাপ ১৯৫৪ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলে যোগ দেন। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি প্রধানশিক্ষক। ডঃ মাইকাপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইতিহাসে এম· এ· এবং সমর-শিক্ষায় (এন· সি সি·) পিএইচ· ডি·। শ্রীমাইকাপই ভারতবর্ষে সমর-শিক্ষায় প্রথম পিএইচ· ডি·। ১৯৭৫ সালে তিনি এন· সি· আর· টি·'র জাতীয় পুরস্কার এবং ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান লাভ করেছেন। বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ মাইকাপ স্কুলে ইংরেজি ও ইতিহাস পড়ান।

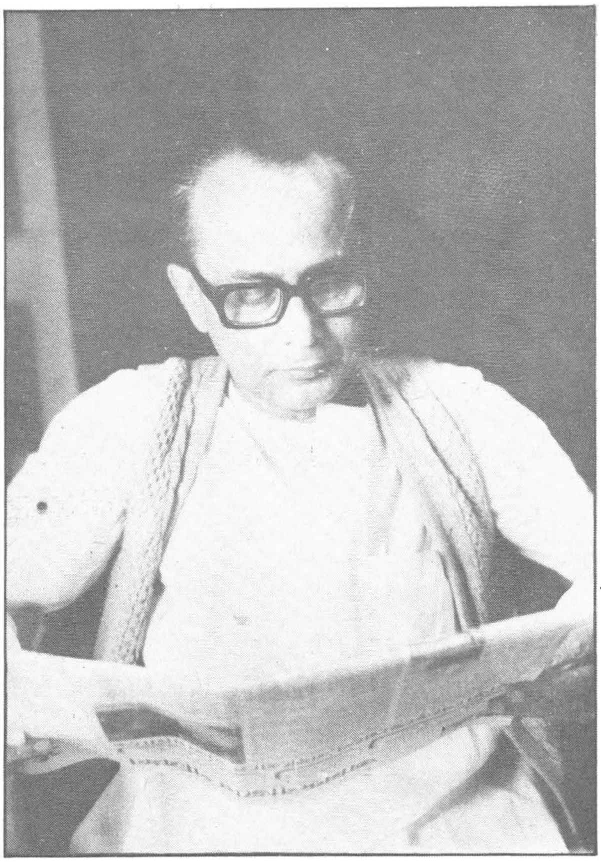

কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যাবে—এই প্রশ্নের উত্তরে **প্রধানশিক্ষক জানালেন,** "পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য ভালভাবে পড়াশোনা করা দরকার। **ঠিকমতো ক্লাসে আসতে হবে। যখন-তখন ছুলছুতোয় ক্লাস-ফাঁকি দেওয়া চলবে না। নিয়ম করে হোমটাস্ক করতে হবে। স্বাধীনভাবে লেখার অভ্যাস করতে হবে। প্রথম প্রথম ভুলভাল হবে—তাতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই।** অভিভাবক বা মাস্টারমশাইদের দেখিয়ে সংশোধন করে নিতে হবে। বানান ভুল করে না, এমন লক্ষ্মীছেলের সংখ্যা তো আঙুলে গোনা যায়। এদিকে সতর্ক থাকতে হবে। **পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা পেলে পরীক্ষকরা খুশি হন, এ-কথা মনে রাখতে হবে।**"

কীভাবে ইংরেজি ও বাংলা পড়লে ভাল নম্বর উঠবে—এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ মাইকাপ বললেন, "ইংরেজি ও বাংলা দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুটি বিষয়ে ভাল নম্বর তোলা এমন

কিছ কঠিন নয়। একটু মন দিয়ে পড়লেই হবে। শুধু পড়লেই হবে না, পড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাই লেখার অভ্যাস। কারও সাহায্য না নিয়ে একেবারে স্বাধীনভাবে লেখার অভ্যাস। **পাঠ্যবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। তার কারণ এখন অধিকাংশ প্রশ্নই অবজেকটিভ ধরনের, পাঠ্যবই ভালভাবে পড়া না থাকলে উত্তর লিখতে বসে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হয়।** বাংলা ব্যাকরণ আর ইংরেজি গ্রামারকে কোনওভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা চলবে না। **ব্যাকরণই ভাষার ভিত গড়ে তোলে।** আর একটা কথা, নোটবই না-পড়াই ভাল। **বাজার-চলতি** অধিকাংশ **নোটবই** অসার বস্তুতে ঠাসা, এইসব বই **পড়ে লাভ যতটা না হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় ক্ষতি।** দুই ভাষার প্রধান প্রধান লেখকদের নানা ধরনের বই ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়া দরকার। এর ফলে পড়ুয়াদের চিন্তা-ভাবনার জগৎ প্রসারিত হবে।”

ইতিহাস সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। বললেন, “**ইতিহাসের মতো জীবন্ত বিষয় আর দুটি নেই। এই একটি বিষয়ই অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রটিকে ঠিকভাবে ধরে রেখেছে।** ইতিহাস পড়তে হবে দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। **দেশের ইতিহাস যে জানে না, সভ্যতার ইতিহাস জানে না, সে তো কিছুই জানে না।** যিনি ইতিহাস পড়াবেন, তাঁকেও মনপ্রাণ ঢেলে পড়াতে হবে, নমো নমো করে পড়ালে চলবে না। এই বিষয়টিতে কোনও ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই। উত্তর সংক্ষিপ্ত হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু যথাযথ হতে হবে। নম্বরও ওঠে খুব ভাল। **ছেলেমেয়েদের বছরে অন্তত দু'বার ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখিয়ে আনা দরকার।** এর ফলে ইতিহাসের জ্ঞান বাড়বে, বিষয়টির প্রতি ভালবাসাও জন্মাবে।”

অঙ্ক আর বিজ্ঞান বিষয় দুটি সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক শ্রীমাইকাপ জানালেন, “অঙ্কে অনুশীলন ছাড়া ভাল নম্বর তোলার দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই। **প্রতিদিন নিয়মিত বাড়িতে অঙ্ক কষতে হবে।** ছেলেরা তত নয়, কিন্তু দেখেছি মেয়েরা অঙ্ক মুখস্থ করে। এটা খুব বাজে অভ্যাস। আর বিজ্ঞান? বিজ্ঞানও কিন্তু মুখস্থ করবার বিষয় নয়। মাথা পরিষ্কার রেখে বুদ্ধি খরচ করে বিজ্ঞান বুঝতে হয়, পড়তে হয়। ছবি চার্ট মডেল ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞান পড়াতে পারলে জটিলতা অনেক কেটে যায়, বিষয়টি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং পড়ুয়াদেরও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা সম্ভবপর হয়ে উঠবে—যিনি বিজ্ঞান পড়াবেন তাঁকে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে।”

ভূগোল সম্পর্কে প্রায় একই কথা বললেন প্রধানশিক্ষক। “ভূগোলে ম্যাপের দরকার হয়। সেজন্য ম্যাপ আঁকা অভ্যাস করতে হবে এবং ভূগোল পড়তেও হবে ম্যাপের সাহায্য নিয়ে। ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ভূগোল ভাল জানা থাকলে ইতিহাস বুঝতে সুবিধে হয়।”

কর্মশিক্ষা সম্পর্কে শ্রীমাইকাপের অভিমত : বিষয়টি মন্দ নয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের তেমন কাজে লাগে না।

“'আনন্দমেলা'র মতো এমন নির্দোষ পত্রিকা কিশোরদের জন্য আর দুটি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এরকম কাগজ আমরা ছেলেবেলায় পাইনি, পেলে বর্তে যেতাম,” আনন্দমেলা সম্পর্কে আনন্দিত প্রধানশিক্ষক বললেন, “এই কাগজটি থেকে আমি কত যে মণিমুক্তো আহরণ করি, তা বলবার নয়।”

শ্যামলকান্তি দাশ

ফোটো : রাজীব বসু

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

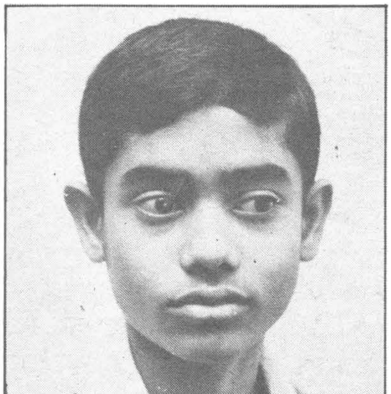

টালিগঞ্জের দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য। ফাইভ থেকে এই স্কুলে পড়ছে আনন্দেশ্বর। বরাবর ফার্স্ট হয়েছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বরের মধ্যে আনন্দেশ্বর পেয়েছে ৬৭২। ওর মতে, “রেজাল্ট খুব খারাপ হয়েছে, কাউকে জানাবার মতো নয়। কিন্তু মাধ্যমিকের ফলাফল এত খারাপ হবে না।”

আনন্দেশ্বরের বাবা-মা দু'জনেই শিক্ষকতা করেন। বাবা ওকে বাংলা ও ইংরেজি দেখিয়ে দেন। একজন গৃহশিক্ষক আছেন, তিনি দেখিয়ে দেন অঙ্ক আর ভৌতবিজ্ঞান। আনন্দেশ্বর সারাদিনে সাত-আট ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিনে আর-একটু বেশি। পড়াশোনার ফাঁকে আঁকা আর লেখার কাজও চলে। কারণ আঁকা আর লেখা দুটোই ওর খুব প্রিয়।

আনন্দেশ্বর ইংরেজিতে পি· কে· দেসরকার আর শৈলেশ সেনগুপ্ত, বাংলায় ডঃ নির্মল দাশ ও শশাঙ্কশেখর সিংহের বই পড়ে। অঙ্কে কেশব নাগ, মৃদুল সেন ও কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলির বই। ভূগোলে পড়ে সুভাষরঞ্জন বসু ও দেবাশিস মৌলিকের বই। ইতিহাস : কিরণচন্দ্র চৌধুরী। রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'অ্যাডভান্স হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইটি থেকেও খুব সাহায্য পাচ্ছে আনন্দেশ্বর। জীবনবিজ্ঞানে পড়ে চৌধুরী-ভট্টাচার্য- সাঁতরার বই। পদার্থবিজ্ঞান : সুখেন্দু মাইতি। ওর অতিরিক্ত বিষয় : বলবিদ্যা। বলবিদ্যায় পড়ে ধীরেশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বই। প্রিয় বিষয় : জীবনবিজ্ঞান।

ফুটবল ও ক্রিকেটে তেমন উৎসাহ নেই আনন্দেশ্বরের, কিন্তু দাবা খেলা ওর খুব প্রিয়। দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে ও 'স্বপ্নের খেলোয়াড়' মনে করে। ফুটবলার কৃশানু দে'কেও ওর ভাল লাগে।

গল্পের বই, হাতের কাছে যা পায়, পড়ে। কিন্তু ওর প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আর মতি নন্দী। ওর প্রিয় তিনটি বইয়ের নাম 'মিশর রহস্য', 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'ননীদা নট আউট'। বিদেশী লেখকদের মধ্যে প্রিয় রবার্ট লুই স্টিভেনশন এই· জি· ওয়েলস।

আনন্দেশ্বর ভবিষ্যতে ছোটদের পত্রিকার সম্পাদক হতে চায়। 'আনন্দমেলা' ওর প্রিয় পত্রিকা। এই পত্রিকা থেকে ও অনেক পেয়েছে।

"এখন এমন এক সাবান পেয়েছি, যা দেখি লাক্সের চেয়েও চমৎকার!"—বলেন শ্রীদেবী.

নতুন লাক্স

মনমাতানো নতুন সুবাস

ফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধের তাজা সুবাস, যার পঞ্চমুখে প্রশংসা চিত্রতারকাদের নিজের ভাষায়— 'দারুণ,' 'মনোরম' 'অপূর্ব'।

দর্শনীয় নতুন রূপ

আপনার মতনই দর্শনীয় আর আধুনিক আর দারুণ আকর্ষণীয়। তিনটি মনোমুগ্ধ করা রঙে: গোলাপী. সবুজ আর হলদে।

নতুন
লাক্স
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

L—2012

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

চলো, হারিয়ে যাই

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

নীল জানত না শহুরে ছেলে বলে কিছু হয়। স্কুলে ইংরেজি পরীক্ষার জন্য তাকে ডায়লগ শিখতেই হয়। সেখানেই সে প্রথম এটা পেয়েছিল। শহরের ছেলে আর গ্রামের ছেলের মধ্যে কথাবার্তা। এ বলছে শহর ভাল, ও বলছে গ্রাম ভাল। ব্যাপারটা নীলকে তেমন ছুঁতে পারেনি। ধানখেত ছাড়া গ্রাম আর কিসেই বা আলাদা। তেমনি শহরে কারখানা আছে। এ কোনও তফাত হল ? পরে ডায়ালগের বিষয় বদলে গেলে নীলও ভুলে যায় গ্রাম-শহরেরর ব্যাপারটা। তার কাছে সারা শহর পৃথিবী হয়ে যায়।

নীল শহরের ছেলে। খাস কলকাতার সুইনহো স্ট্রিটে তারা থাকে। বাবা অফিসার। মা স্কুলে পড়ান। নীল নিজে এখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। বোন তিস্তা পড়ে ফাইভে। মঞ্জুদি নামে একজন তাদের পরিবারে থাকে। নীল জানে মঞ্জুদি-ই তাদের বাড়ির বেশির ভাগ কাজকর্ম সামলায়।

সুইনহো স্ট্রিটে চারতলার এই ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যে বাবা-মা'র বন্ধুবান্ধব এসে থাকে। সব মিলে (ন-পিসি আর ছোড়দাদুকে ধরলে) নীল দেখেছে সে পঁচিশজন মানুষকে চেনে। নীল আজ থেকে দু'বছর আগে এই পঁচিশজনের একটা অ্যালবাম বানিয়েছিল। অবশ্য তাতে কোনও ফোটোগ্রাফ ছিল না। নীল পঁচিশটি পৃষ্ঠায় এঁদের অদ্ভুত সব ছবি এঁকেছিল।

গত দু'বছরে নীল ভীষণরকম পাল্টে গেছে। তার গলার স্বর বদলেছে। শরীরটাও হঠাৎ একটু বেড়ে গেছে। মনও ভাল নেই। কিন্তু কেন যে মন ভাল নেই তা বুঝে ওঠা নীলের অসাধ্য। নিজের এই বেয়াড়া লম্বা শরীরের মধ্যে মনটাকে সে আটকেই রাখতে পারছে না। গত বছর তো রেজাল্ট বেশ খারাপ হয়েছে। যদিও নীল জানে তার প্রস্তুতি ভালই ছিল। হঠাৎ যে সে সেকেণ্ড বয় থেকে পিছলে ফোর্থ পজিশনে চলে এল, তার কারণ আলাদা। জানা থাকা সত্ত্বেও সে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরীক্ষায় দুটো প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েছিল।

প্রকৃতিবিজ্ঞানে নীলের দুর্বলতার কথা বাবা জানতেন। বাবা ভুরু কুঁচকে নীলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা কী করে হল নীল, দ্য গ্রেট নীল, যে কিনা উদ্ভিদ জগৎ থেকে ঠিকরে এসে পড়েছে এখানে, সেই মহান তারকা প্রকৃতিবিজ্ঞানে ভাল স্কোর করতে পারল না !"

"প্রকৃতি বললে শুধু উদ্ভিদ বোঝায় নাকি ?"

"ও, বাবা, তাই তো !"

দিনকয়েক মাকে সে উদ্বিগ্ন দেখেছিল। তারপর বাবা-মা দুজনে নীলকে নিয়ে কীসব আলোচনা করলেন দিনকয়েক। এরপর দেখা গেল মেঘ কেটে গেছে। মা আরও বেশি করে 'নীল' 'নীল' করছেন। যদিও হিংসুটে তিস্তার ব্যাপারটা আলাদা। সে সব সময় খোঁচা দেওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অস্থির মনকে নীল গত এক বছরে বেশ কিছুটা সুস্থির করতে পেরেছে। এ-ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করল, তার ছোট্ট বইয়ের র‍্যাকটি। লুই ক্যারোল, আণ্ডারসন, বিভূতিভূষণ এবং জিম করবেট। ইদানীং নীল যাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় একেবারে গদগদ তিনি একজন ভারতীয়। পক্ষিবিশারদ হিসেবে তাঁর বিস্তর নামডাক। মাউনটেন কোয়েলের খোঁজে ৯১ বছর বয়সে সেই বৃদ্ধ দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ট্রেকিং করছেন এখন।

নীলের ইচ্ছে হয় 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্করের মতোই নক্ষত্রমণ্ডল চিনতে। এই ইচ্ছেকে সে আজও সফল করতে পারেনি। বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের বাইরে আসামাত্র নীলের সব

গুলিয়ে যায়। কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, ক্যাসিওপিয়া কাউকেই সে খুঁজে পায় না কলকাতার আকাশে। কোন্ মাসে কোন্ নক্ষত্র ছবির মতো ফুটে ওঠে, নীলের সব মুখস্থ। কিন্তু তাতেই বা লাভ কী! সে তো অনায়াসেই ধ্রুবতারা খুঁজে পেয়েছিল। নক্ষত্র জগৎ সম্পর্কে নীলের উৎসাহে ভাটা পড়তে দেরি হয়নি। আর মনের ওই শূন্য জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি দখল করে নেয় সবুজের ইতিহাস।

হ্যাঁ, সবুজেরও একটা ইতিহাস আছে। আছে বিবর্তন। পৃথিবীতে কত বিচিত্র ধরনের গাছপালা জন্মেছে। তাদের নানা জাত, নানা চেহারা, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ একেবারে হারিয়ে গেছে, কেউ-কেউ মাথা উঁচু করে টিকে আছে এখনও।

পরিচিত মানুষের যে অ্যালবামটি নীল তৈরি করেছিল, সেটা হয় কোথাও হারিয়ে গেছে, নয়তো ধুলো-ময়লা খেতে-খেতে ধুলোরই নীচে চাপা পড়ে গেছে। আবার সে জায়গাটাও ফাঁকা নেই। এখন নীল ফার্ন জাতীয় গাছের একটা অ্যালবাম তৈরি করছে। একদিকে তার হাতে-আঁকা ছবি, আরেক দিকে ওই বিশেষ ধরনের ফার্ন সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি খবর, আর নিজের মন্তব্য লিখে রেখেছে। এই তো কিছুদিন আগেই ও এক বিশেষ ধরনের ফার্নের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল, পরীক্ষায় এসব আসে না। এদিকে পরীক্ষাও এসে গেল। এখন আদা আর নুন খেয়ে লেগে পড়া দরকার।

দুই

ধওলা সর্দারের ছেলে মওলা আজও জানে না ব্যাপারটা। সে নীলের সঙ্গে ভাব করতে পেরেই মহাখুশি। মওলা নীলকে বেশ এক জবরদস্ত হিরোও ভেবে বসেছিল। মওলার সঙ্গে নীলের দূরত্ব আছে। আবাদ ভগবানপুরের সঙ্গে কলকাতার সুইনহো স্ট্রিটের দূরত্ব।

নীল টেবিলে মাথা কাত করে রেখে এই সব ভাবছিল। খোলা জানলা দিয়ে সামনের লাইটপোস্ট, দূরে একটা ন'তলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নীল সে-সব দেখছে না। সে ভাবছে, বালিগঞ্জ স্টেশন আর কতই বা দূর। সেখান থেকে ট্রেন ধরো। তারপর বাস, ভ্যান-রিকশা, মাঝে একটা নদী, তুমি পৌঁছে গেলে আবাদ ভগবানপুর। কিন্তু সত্যিই কি পৌঁছে গেলে? মওলাদের বাড়ির খাবার বিশ্রী, বাজে; ভয়ংকর খিদে না পেলে মুখে দেওয়া যায় না! অন্তত নীলের পক্ষে। আর ভয়ংকর খিদে কাকে বলে তেরো বছরের জীবনে সে আজও তা জানতে পারেনি।

নীল, তুমি কি…

আচ্ছা, তোমার কি হুঁশ নেই যে আজ বাদে কাল পরীক্ষা!

গ্যাসের উনুনের চাবিটা কি ঘুরিয়ে দিলেন মা! তা হলে তো এক্ষুনি এ-ঘরে চলে আসবেন। নীল মাথা তুলল, সামনে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বই খোলা রয়েছে। নীল পড়ার ভঙ্গিতে নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। খোলা বইয়ের পাতায় সে শামুকের ফসিলের ছবি দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল প্রকৃতিবিজ্ঞান বইটাও কি প্রকৃতির ফসিল। এরকম একটা দার্শনিক বিষয় নিয়ে যে মাথা ঘামাবে তারই বা উপায় কোথায়। কেননা, সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, তিস্তা গতবার প্রকৃতিবিজ্ঞানেও সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে।

নীল যখন আরও ছোট, পাঁচ বা ছ' বছর বয়স, তখনই কি সে টের পেয়ে গিয়েছিল যে, ছোট বোনটাই তার এক নম্বরের শত্রু হবে। প্রতিবার সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে নীলের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেবে। তিস্তাকে সেই ছোটবেলায় চিমটি কেটে রক্ত বের করে দেওয়ার বকাঝকা তাকে এখনও খেতে হচ্ছে। সবসময় ওর সঙ্গে নীলের তুলনা! কী বোঝে ও! বইয়ের অক্ষর ছাড়া আর কতটুকুই বা ও জানে!

না, নীল তিস্তার কথা ভাববে না। মা'র কথা ভাববে না। কারও কথা ভাববে না। কিন্তু মুশকিল হল, কিছু না-ভেবে যে থাকা যায় না। মাথার মধ্যে সবসময় কিছু-না-কিছু একটা থাকবেই। তাড়াবার চেষ্টা করলে পানাপুকুরের ভুড়ভুড়ির মতো শব্দ হয়। (ধন্যবাদ মওলা, শুধু বাঘের মধু খাওয়ার গল্প শোনা নয়, পানাপুকুরের ভুড়ভুড়িও নীল তোমার জন্যই দেখতে পেয়েছে।) আর সত্যি কী আশ্চর্য! কী সুন্দর! নিশ্চয়ই এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। জলে কেন ভুড়ভুড়ি ওঠে। আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যদি না থেকে থাকে তা হলে নীলের পক্ষে আরও চমৎকার। সে আবিষ্কারের চেষ্টা করার একটা চান্স পাবে। বই পড়লে, বা বাড়ির মাস্টারমশাই সমীরবিষ্ণুবাবুকে জিজ্ঞেস করলে দেখা যায় পৃথিবীর সব কিছুই প্রায় জানা হয়ে গেছে। যেন আর কোনও রহস্য নেই। যেন পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে।

নীল নিজের চোখে দেখে এল ঢেঁকিশাক। একেবারে বইয়ের সঙ্গে মেলানো। হুবহু এক। নিজের চোখ কি সে অবিশ্বাস করবে? মওলা জল-জঙ্গলের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু সে এসব কিছুই জানে না। কাজকর্মের ফাঁকে বিচিত্র সব গাছগাছালির, শ্যামলিমার আর জলের শব্দ তাকে মাঝে-মাঝে কেমন যেন বিভোর করে দেয়।

বইয়ে এই ধরনের গাছের একটা জাত আছে। নিমাটোফাইকাস। নিশ্চয়ই লাতিন শব্দ। যা কিছু পুরনো সব কিছুকেই কেন যে লাতিন ভাষায় ডাকা হয়, সে আর এক রহস্য। বানানটা? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, এন, ই, এম, এ, টি, ও—নিমাটো; পি, এইচ, ওয়াই, সি, ইউ, এস—ফাইকাস। বাংলায় এর মানে হল শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। প্রাচীন সিলুরিয়ান স্তরেও সুবৃহৎ শৈবাল জাতীয় এইসব গাছ দেখা যেত। এখন সমুদ্রেই শুধু এ-ধরনের গাছের হদিস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঢেঁকিশাক নাকি আর পাওয়াই যায় না।

কী বুদ্ধি। ঢেঁকিশাক পাওয়া যায় না। ঢেঁকিশাকের যুগ (এজ অব ফার্নস) নাকি শেষ হয়ে গেছে। অথচ মওলার সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে নীল মৈপিঠের কাছে নিজের চোখেই ঢেঁকিশাক দেখে এসেছে।

তিন

মা আপত্তি করেছিলেন। নীলকে যেতে দিও না। বাবা বললেন বলেই যাওয়া হয়েছিল। আর বাবা না বললে নীল কোনওদিনই মওলার কথা জানতে পারত না। মওলাকে দেখার পর নীলের প্রথমেই ইচ্ছে হয়েছিল, অদলবদল করার। অর্থাৎ মওলা নীল হয়ে যাক। আর নীল হয়ে যাক মওলা। যদিও মওলাকে সে-কথা বলাই হয়নি।

ভূগোলের মাস্টারমশাই বিমলবাবু ছিলেন গাইড। নীলদের দলে ছিল আটজন ছাত্র। এক শনিবার সকালে তারা

ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন ধরল। সেদিন নীলকে খুব ভোরে উঠতে হয়েছিল। তারিখটা যদ্দূর মনে পড়ে ৪ মে, ১৯৮৫। নীলের মনে পড়ে গেল, গ্যালিভারের যাত্রাও শুরু হয়েছিল ৪ মে। তবে সালটা ১৬৯৯। আর নীল যাত্রা করল ১৯৮৫তে। অর্থাৎ ২৮৬ বছর পরে। নীল, এটুকু মনে পড়ে যেতেই, বেশ নেচে ওঠে। যেন প্রায় তিনশো বছর পরে আরেক গ্যালিভারের বৃত্তান্ত শুরু হতে যাচ্ছে।

'অল ওয়েন্ট ওয়েল ফর দ্য ফার্স্ট ফিউ উইকস। দেন দেয়ার ওয়াজ আ ব্যাড স্টর্ম অ্যাণ্ড দ্য শিপ ওয়াজ রেকড্।' নীলের ক্ষেত্রে কিন্তু এ-জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটল না। ট্রেনের উলটে যাওয়া দূরের কথা, এমনকী ওভারহেডের তারও কাটল না কোনও ছিঁচকে চোর। মথুরাপুর এসে গেল দু'পাশে সবুজের ডালি নিয়ে। ধান তখনও গাঢ় সবুজ। বিমলবাবু মণীশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হ্যাঁ রে, ধানগাছে তক্তা হয় তা জানিস ?" আটজন ছাত্র হো-হো হাসিতে কামরা ফাটিয়ে ফেলে আর কি, "স্যার, ওই তক্তাগুলো কি করাত দিয়ে কাটা হয়, নাকি কাস্তে দিয়ে ?" দেখা গেল শহুরে ছেলে হলেও এসব তাদের জানা আছে। এমনকী ক্লাস-ওয়ানে ভর্তি হওয়ার আগেই এসব শিখতে হয়েছিল। না হলে ভর্তিই হতে পারত না। তবে নীল ধানগাছ জীবনে এই প্রথম দেখল। সে দেখল, এখানকার আকাশটাও আলাদা। যার থেকে নীলের মনে হল, আকাশ হাজাররকম হতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে গবেষণার ভূত আবার মাথায় চেপে বসল। আচ্ছা, আকাশের রঙ নিয়ে গবেষণা করা যায় না ? কেউ কি করেছে ?

"নীলকুমার, কী ভাবছ," বিমলবাবু নীলকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন। সঙ্গে সেই স্মিত হাসি, যা দেখলে বিমলবাবুর ছাত্ররা তাঁর কাছে দারুণ সহজ হয়ে পড়ে।

"কিছু না, স্যার।"

"আরে বলেই ফেলো না।"

"ভাবছিলাম আকাশটা কী ঝকঝকে, আচ্ছা স্যার, আকাশে এত রঙ কোত্থেকে আসে ?"

"খালি চোখে যদ্দূর দেখা যায় রঙ আছে ততদূরই।"

"তারপর ?"

"অন্ধকার ?"

"হ্যাঁ, বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে গেলে আর রঙ পাবে না, গাগারিন, নীল আর্মস্ট্রং এইসব মহাকাশচারীরা যা বলেছেন তাতে তাই মনে হয়। মহাকাশে আছে শুধু অন্ধকার।"

নীল প্রশ্ন করতে পারত, 'মহাকাশ কেন অন্ধকার ?' কিন্তু তখনই হৈহৈ রব উঠল। মথুরাপুর এসে গেছে। তা ছাড়া সে মহাকাশচারী গাগরিনের নাম শুনেছিল, কিন্তু নিজের নামের সঙ্গে ভিনদেশী পদবি-মেশানো কোনও মহাকাশচারীর নামই এর আগে শোনেনি। মাস্টারমশাইয়ের কথা তার খুব ভাল লাগল। এও বুঝল, এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কার একমাত্র এই মহাকাশকে ঘিরেই ঘটতে পারে। জল-স্থল শেষ। পৃথিবী ফুরিয়ে আসছে। জানা যাবে না আর বিশেষ কিছু। এই যে তারা এক নতুন দেশে এল, বিমলবাবুর মতে যেখানে মাটির ভাঙা-গড়া, নতুন দ্বীপের গড়ে ওঠা আজও সমান তালে চলেছে, সেখানে কি আর আবিষ্কার করার মতো কিছুই পড়ে নেই !

চার

এ-অঞ্চলে বাবলাগাছের অন্ত নেই। সুন্দরীগাছের বন থেকেই হয়তো নামটা এসেছিল। বা পার্জিটারসাহেব বলেছেন 'সমুদ্দুর' আর 'বন' এই কথা দুটো জুড়ে গিয়েও হয়তো সুন্দরবন নামটা পাওয়া যায়। বিমলবাবুর কথাগুলো নীলের মাথায় ঘুরছিল। সে নদীর ধারে বসে আছে। কামঠের ভয়ে জলে পা দেয়নি। দূরে বিমলবাবু অন্যদের কীসব বোঝাচ্ছেন। কে অত বোঝে ! নীলের ভাল লাগছিল না।

নদীর ধার ঘেঁষে একটা নৌকো এগিয়ে আসছে। তীরের দিকে কুচোমাছ বেশি পাওয়া যায়, স্যার বলেছিলেন। একজন আবলুশ কাঠের মতো কালো মানুষ নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে। সে নিজেই নৌকো বাইছে আর মাছ ধরছে। ছোট নৌকো। বিমলবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "নীল, চলো, খাবার সময় হয়ে গেছে।"

মৈপিঠে এক জমিদারের কাঠের বাড়িতে তারা উঠেছে। দোতলা কাঠের বাড়ি। ভারী চমৎকার। কাঠের ফাঁক দিয়ে

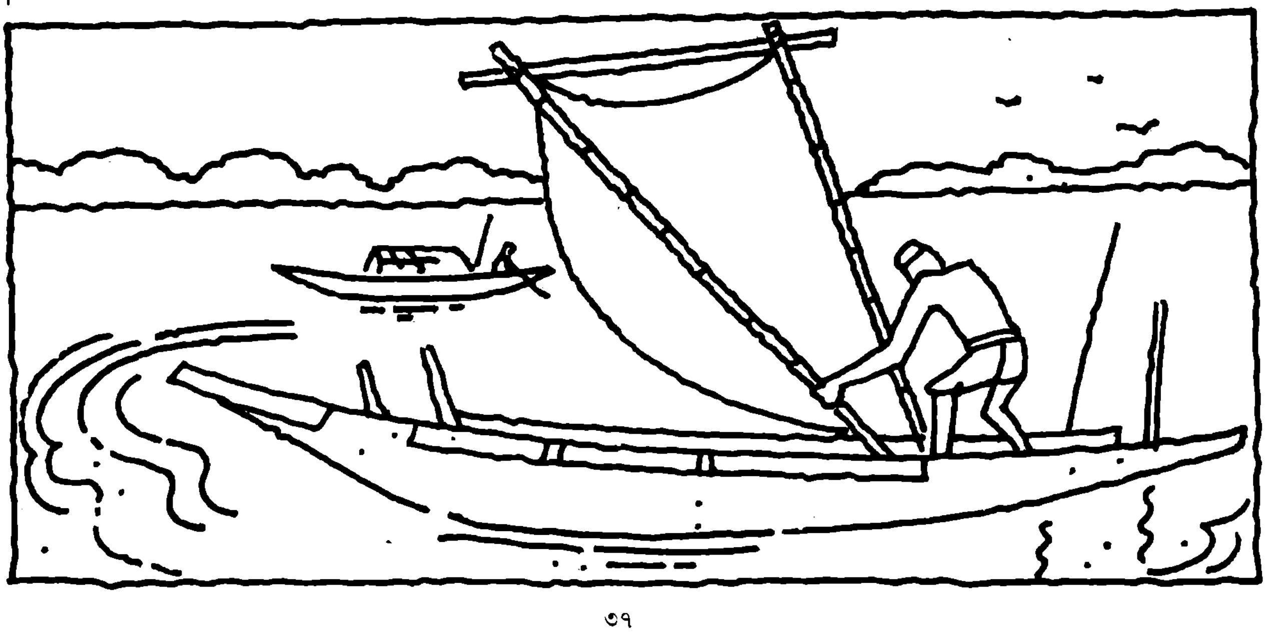

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!" — ফেভি ফেয়ারী

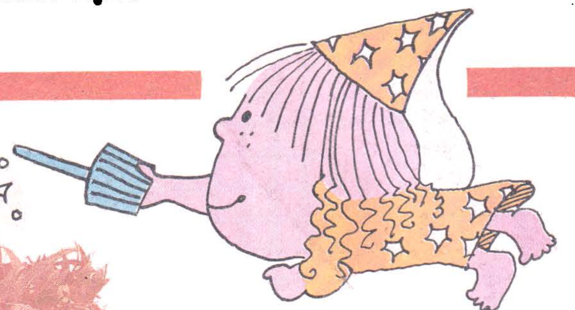

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এটা-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই,
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি--বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

বিনামূল্যে জাপানী ফুলগুলো এবং ক্রিসানথেমাম কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান অথবা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

বিনামূল্যে জাপানী ফুলগুলো এবং ক্রিসানথেমাম কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট.বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

নাম: ______________________

বয়স: ______________________

ঠিকানা: ______________________

____

শহর: ______________________

রাজ্য: ____________ পিনকোড: ____________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্‌ট পত্রিকাটি পেয়েছেন? হাঁ/না

(A)

ফেভিকল ® এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিস গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি [logo] আর ফেভিকল ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-7070 BN

ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়ছে। নীলদের ক্লাসের হর্ষর আবার শরীরটা খারাপ হয়েছে। সে শুয়ে শুয়ে ওই টুকরো আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। "শরীর খারাপ করার আর সময় পেলি না," নীল তাকে জিজ্ঞেস করল।

এতে হর্ষ আরও চটে যায়, "তুই নিজে তো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিস।"

নীল আর হর্ষকে ঘাঁটাল না। সত্যি, বেচারার আসাটাই মাটি হল।

কথা ছিল দুপুরে একটু বিশ্রামের পর স্যারের সঙ্গে নদীর ধারে, বাঁধের কাছে যাওয়া হবে। জোয়ার-ভাটা আর বন্যা নিয়ে স্যার কথা বলবেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যে-যার জায়গায় শুয়ে পড়ল। বিমলবাবু বসে রইলেন সিঁড়ির মুখে। আর ঠিক তখনই নীলের মাথায় এল, একবার একা-একা ঘুরে আসতে হবে। কিন্তু বিমলবাবু যে সিঁড়িতে বসে আছেন!

চারদিক ভেবে নীল একটা ফন্দি বার করল। সে বিমলবাবুকে গিয়ে বলল, "স্যার, জ্বরে হর্ষর গা-পুড়ে যাচ্ছে, ভুল বকছিল, এখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।" সত্যি হর্ষ তখন ঘুমে অচৈতন্য। গায়ে বেশ জ্বর। বিমলবাবু হর্ষর মাথার কাছে বসে পড়লেন। তারপর কী ভেবে নীলকে বললেন, "তুমি সিঁড়িতে একা-একা বসে পাহারা দিতে পারবে?"

নীল যেন কিছুই জানে না এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী পাহারা দেব স্যার?"

"যাতে কেউ একা না বেরিয়ে যায়," বিমলবাবু বললেন।

নীল তো হাতে যেন স্বর্গ পেল। কিন্তু মুখ-চোখ এমন গম্ভীর করে ঘাড় কাত করল, যেন সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল। সবটা ভাল করে বুঝে নিয়েছে।

নীল একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা নদীর ধারে চলে এল। সকালের দেখা নৌকোটা পাড়েই বাঁধা ছিল। হাওয়ায় নৌকোটা এমনভাবে দুলছে যেন নীলকে ডাকছে, কাছে এসো, নৌকোয় ওঠো। চলো, তোমাকে সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখাই। কে বলেছে সব রহস্য শেষ হয়ে গেছে? কে বলেছে পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে? তুমিই তো প্রথম মানুষ, যাকে এখানকার সব রহস্য দেখাব!

নদীতে তখন ভাটা। অনেক দূর পর্যন্ত কাদা। স্রোত খুব মৃদু। এসব দেখেই নীল বুঝল, একেই ভাটা বলে। তা ছাড়া সকালবেলা স্যার নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তখন জোয়ার চলছিল।

অনেক দূরে ন্যাড়া মাথার মতো একটা দ্বীপ জেগে আছে। সেখানে গুঁড়ি-গুঁড়ি সবুজ। নীল কী ভুলই না করেছে ছোটমামার দেওয়া বায়নোকুলারটা সঙ্গে না এনে। খোদ জাপানের জিনিস। সত্যি ওরা অদ্ভুত। বিধ্বংসী বোমা হজম করে ফেলল। আবার এখন যেসব বোমার কথা শোনা যাচ্ছে সেগুলো ফাটালে এই পৃথিবী, দূরের ওই সবুজের গুঁড়ি, মাথার ওপর চক্কর-খাওয়া ধবধবে সীগাল, একলাটি নদীর বুকে ভাসন্ত এই চমৎকার দোলনা, সব হারিয়ে যাবে। তখন আর রঙ থাকবে না। মহাকাশের অন্ধকারই হবে শেষ কথা।

নীল কখন যে নৌকোটিতে উঠে বসেছে, নিজেই জানে না। জলে কী যেন একটা ডিগবাজি খেল। জন্তুটার রঙ ধূসর। কুমির কি? হতেও পারে। জোর নয়, মৃদু বাতাস ছিল। নদীর বাতাসে কেমন ঘুম-ভাব জড়িয়ে থাকে। আচ্ছা,

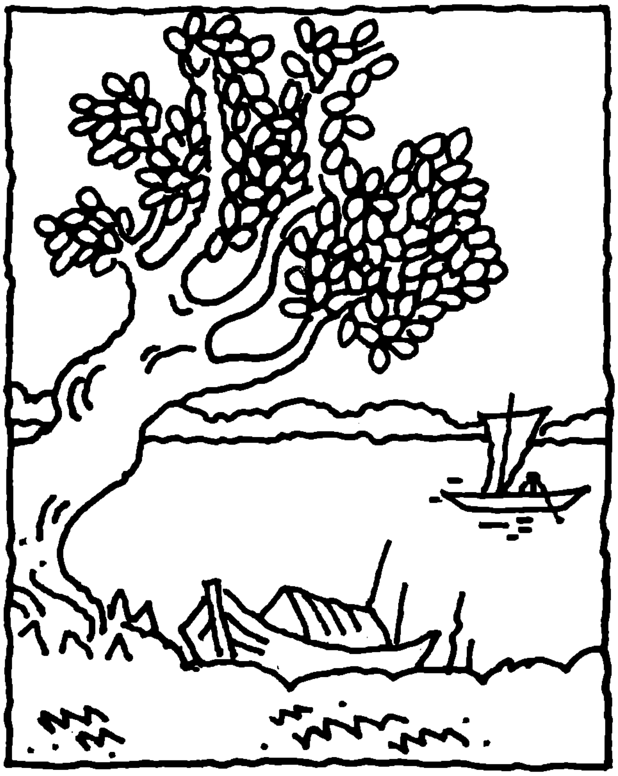

নৌকোটা ফেলে সেই লোকটা গেল কোথায়! দেখা যাচ্ছে, ছইয়ের মাথায় জাল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। অথচ নৌকোর খোলে কোনও মাছ নেই। হুঁকোটা একপাশে কাত হয়ে আছে। বেশ যত্ন করে হুঁকো ঝেড়ে রেখে গেছে সে। নীল আবার সেই দ্বীপটির দিকে তাকাল, যেখানে পৃথিবী গড়ার কাজ আজও শেষ হয়নি। পাড়ে বিচিত্র রঙের পাতিকাঁকড়া ছুটোছুটি করছে।

পাঁচ

"কী নাম বাবা তোমার?"

"নীল মিত্র।"

"লিল, লিল, কী সুন্দর নাম গো।"

বাস, ওইটুকু, লোকটি যেন বিশেষ কথা জানে না। তার শব্দের ভাণ্ডার খুব ছোট। কতবার আর সে জিজ্ঞেস করতে পারে। খিদে লেগেছে কি না। ভয় করছে কি না। বা গল্প করার ছলে কতবারই বা বলবে, আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। ভীষণ শহর। কত বড়।

"নদীতে তোমার ভয় করে না," নীল-ই জিজ্ঞেস করল।

"নদীতে!" যেন সে প্রশ্নটাই বোঝেনি, "কেন? ভয় কিসের গো?" নদীতে যে কোনও ভয় থাকতে পারে সে-কথা যেন সে জানেই না।

"কুমিরের ভয়।"

"হ্যাঁ, কুমির আছে বইকী।"

"আর কী আছে?"

"কামঠ।"

"আর?"

"বাঘ।"

"নদীতে বাঘ!"

"হ্যাঁ গো, নদীতে বাঘ। বাঘ সাঁতরে এসে নৌকোয়

ওঠে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী, মানুষ মুখে করে নিয়ে চলে যায়।"

"তোমার ভয় করে না ?"

"ভয় যে একেবারে করে না তা বলা যাবে না। তবে তেমন ভয় করে না। আমার ভয় করেছিল তোমাদের কলকাতায়।"

"কেন ?"

"ও বাবা, যা জোরে গাড়ি চলে, আর কত গাড়ি, মানুষ তো সেখানে পিঁপড়ে।"

"কই, আমার তো কলকাতায় ভয় করে না।"

"তবেই বোঝো। আমারও এখানে ভয় করে না। কিন্তু কলকাতা ! বাবা সাংঘাতিক জায়গা। নদীর থেকে তোমাদের শহরের রাস্তায় ঢের বেশি লোক মরে।"

ছয়

কতটা পথ নদীপথে যাচ্ছে নীল, আন্দাজ করতে পারে না। সে খালি নৌকোয় উঠে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখার পর রোদ বাঁচাতে ছইয়ের নীচে ঢুকে বসে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধওলা সর্দার মাছ বেচে ফিরে এসে নৌকোর খুঁটি তুলে, নৌকো ঠেলে উঠে বসে। ততক্ষণে জোয়ার এসে যায়। অনুকূল স্রোত পেয়ে নৌকো তরতরিয়ে বহু দূর এগিয়ে গেল।

ধওলা সর্দার হয়তো কোনও কারণে আনমনা ছিল। ফলে ছইয়ের নীচে ঘুমন্ত নীলকে সে দেখতে পায়নি। যখন দেখতে পেল, তখন আর কিছু করার নেই। স্রোতের বিরুদ্ধে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা নৌকো বাইলে তবে অতি কষ্টে মৈপিঠে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব। তখন নীলই বলে, "আমাকে কালকে পৌঁছে দিও।"

নীল অবাক হয়ে গেল ধওলা সর্দারের আচরণে। নীলের মতো একটা ছেলের কথাকেও সে গুরুত্ব দিল। দেখা গেল নীলের মতামতেরও একটা দাম আছে। অবশ্য নীল অবাক হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে এডুকেশনাল ট্যুরের ব্যাপারটাই তার মাথায় ঢুকল না। তা ছাড়া দু-চার দিন একটা ছেলের অজ্ঞাতবাসে চলে যাওয়াটা নাকি কিছুই নয়। অবশ্য ধওলা সর্দার বলেছিল, 'তুমি তো আর জলে পড়োনি লিল।' দক্ষিণের ভাষার টান আলাদা, শব্দগুলোও নীলের তেমন পরিচিত নয়। তবে ভাষাটা বাংলা বলে কোনও অসুবিধে হয় না। দেখেশুনে নীলের মনে হল পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ভাষাগুলো জানা থাকলে হারিয়ে যাওয়া কত সহজ। হারিয়ে যাওয়ার মজা পেতে হলে ঠিক ভ্যাবলাকান্ত হলে চলে না। তারও একটা প্রস্তুতি চাই।

'আই ট্রাইড টু আনসার দ্য এমপারর হোয়েন হি স্পোক টু মি, বাট হি কুড নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড এনি অব মাই ল্যাঙ্গোয়েজস হুইচ আই স্পিক। সুন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে...'

জোনাথন সুইফটের নায়ক তা হলে অনেকগুলো ভাষা জানতেন। গালিভার নিজের মুখেই তো বলছে, "এনি অব মাই ল্যাঙ্গোয়েজস।" তবু সে খুদে মানুষদের ভাষা জানত না। সত্যি-সত্যি কি খুদে মানুষের দেশ বলে কিছু আছে। নাকি আফ্রিকান পিগমিদের থেকেই এই কল্পনার উদ্ভব। নীলের মনে পড়ে যায় অ্যালিসের কথা। টেবিল থেকে জলের গ্লাসটি নিয়ে অ্যালিস এক ঢোকে জল শেষ করে ফেলেছিল। তারপর ঘটেছিল সেই আশ্চর্য ঘটনা। অ্যালিস খুদে হয়ে গেল। নিজের চোখের জলে সে বন্যা ডেকে আনল। ওই জলে ভাসতে ভাসতে অ্যালিস ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কারণ ওই ভয়ংকর বিপদে সে একটিই মাত্র জীবন্ত প্রাণীকে সামনে পেল। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যতই ইঁদুরভায়া, ইঁদুরভায়া বলে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেলুক না কেন, ইঁদুরের সাড়া নেই। অ্যালিসকে তখন ভাষা খুঁজতে হয়েছিল। সে ভাবল ইঁদুরটা নিশ্চই ফরাসি ইঁদুর। হয়তো উইলিয়াম দ্য কঙ্কারেরর সঙ্গে এসে থাকবে। অ্যালিস ফরাসিতে জিজ্ঞেস করল, 'উয়ে মা শাও' (আমার বেড়ালটা কোথায় ?)

নীল কি হারিয়ে যাচ্ছে ? সে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করে। ভেবেচিন্তে হারিয়ে যাওয়া নয় এটা, একটা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া ঘটনা। চারদিকে শুধু জল। মাথার ওপর ঢালাও নীল আকাশ। সঙ্গী হিসেবে সে পেয়েছে ধওলা সর্দারকে। যাকে সে আগে কখনও দ্যাখেনি। এরকম মানুষ সম্পর্কে নীলের কোনও ধারণাও ছিল না। কিন্তু ভাল লাগছে। মানুষটার মুখে সবসময় একটা খুশি-খুশি ভাব। যেন তার নিজের মধ্যে এমন সব সম্পদ লুকনো আছে যা আর কেউ জানে না। আবার সে কথা কম বলছে বলে চট করে তা জানাও যাবে না।

কলকাতা শহরের বড় রাস্তা ও গলিঘুঁজির মতোই এখানকার নদীপথ। নীল যেন-বা ধওলা সর্দারের নৌকোয় চেপে রেড রোড থেকে মৌলালি শিয়ালদা পেরিয়ে ন'পিসিদের বাড়ি বাগমারির একটা গলিতে এসে ঠেকল। যার পর শুধু বস্তি। মাঠ। রেললাইন। নীলের অবাক লাগছিল।

সাত

"এই নদীটার কোনও নাম আছে ?" নীল কাদায় পা ফেলে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করল। ধওলা সর্দার উদাসভাবে বলল, "সব নদীরই নাম আছে লিল। এমন কোনও মানুষ আছে, যার নাম নেই ?"

"না, তা হয়তো নেই।"

"তা হলে নদীরও তাই।"

"নদী আর মানুষ কি এক ?"

"আলাদা হবে কেন, একই তো। এর নাম মৃদঙ্গভাঙা।"

ততক্ষণে তারা বাঁধের ওপর উঠে এসেছে। ধওলা সর্দার বলল যে, তাকে একবার মহাজনের বাড়িতে যেতে হবে। নীল জানত না, মহাজন কাকে বলে। সে কথাটা শুনে চোখ গোল-গোল করল। ধওলা সর্দার নীলের চোখমুখ দেখেই বুঝেছিল, নীল বোঝেনি। সে নীলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল, "এই যে নৌকোটা দেখলে, এটা আমার নয়। মহাজনের কাছ থেকে জমা নিয়েছি। এখন তাকে ফেরত দিতে হবে। মাছ বেচে যে টাকা পেয়েছি তার দু'ভাগ মহাজনকে দিতে হবে। এক ভাগ আমার।"

এরপর নীল ধওলা সর্দারকে কী যেন জিজ্ঞেস করেছিল। হয়তো বলেছিল, "মহাজন পাজি, তোমাকে খাটিয়ে নিজে বসে-বসে রোজগার করছে।"

ধওলা সর্দারকে তখন একটু চটে যেতে দেখা গেল। "তুমি যে শুনেই সব বুঝে ফেলছ গো। পাজি হতে যাবে কেন, সে মহাজন, এটাই তার কাজ, যেমন আমার কাজ মাছ মারা, মধু

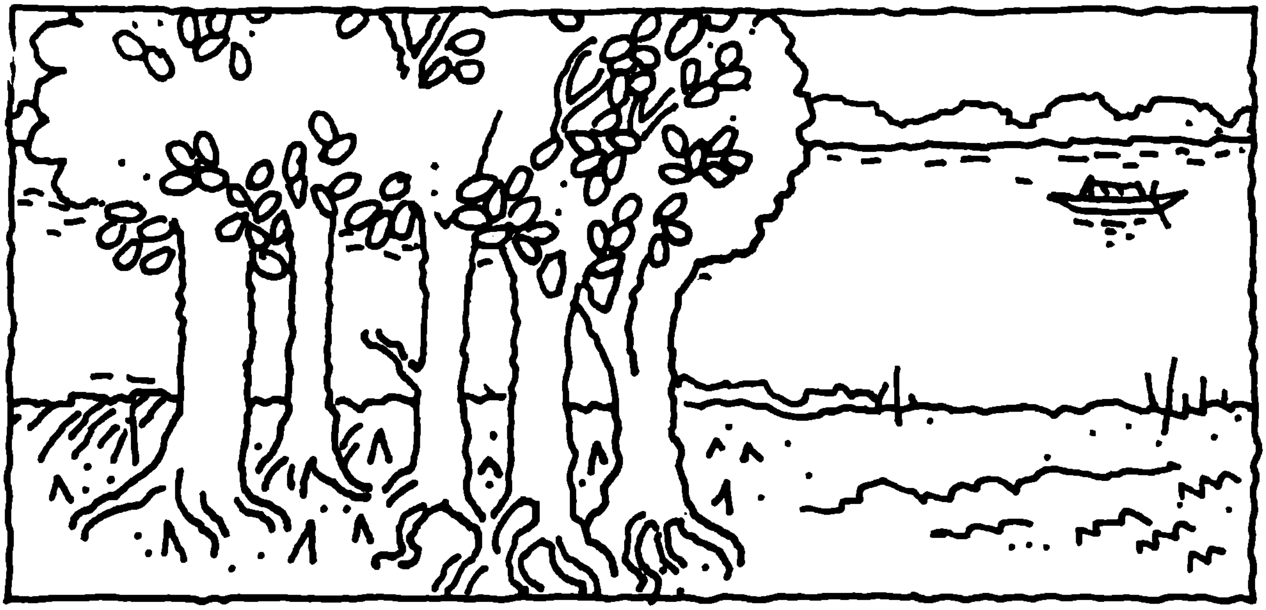

আনা।"

মধু আনার কথা শুনে নীল লাফিয়ে উঠল। খবরের কাগজে মধু-সংগ্রাহকদের সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিল সে। এ খুব সাহসের কাজ। প্রতি পদক্ষেপে বিপদের গন্ধ।

হাঁটতে-হাঁটতে ধওলা সর্দার বেশ বড়সড় একটা বাড়ির সামনে এল। চারদিকটা মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটাও মাটির। ওপরে টালির ছাউনি। ভেতরে, উঠোনের মাঝখানে কাঠের গোলা। ধওলা সর্দার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "মেজোকর্তা আছ ? মেজোকর্তা !" রোগা, ফ্যাকাসে একজন মানুষ বেরিয়ে এল। তার মাথাটা শরীরের তুলনায় অদ্ভুত ছোট।

মেজোকর্তা টাকা-পয়সা বুঝে নিয়ে ধওলাকে সেই দুঃসংবাদটা দিল, "তোমার ছেলেকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।" শুনে ধওলা সর্দারের মুখে দুশ্চিন্তার কয়েকটা আঁচড় ফুটে উঠল। তবে তা মুহূর্তের জন্য। সে নীলের হাত ধরে বলল, "চলো !"

মেজোকর্তা শার্ট-প্যান্ট পরনে ফুটফুটে নীলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল। কিছু একটা হয়তো সে বলতেও চেয়েছিল। কিন্তু ধওলা সর্দার তাড়া লাগানোয় মেজোকর্তা আর সে সুযোগ পেল না।

ছেলের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরে ধওলা সর্দারের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে নীল যথেষ্ট অবাক হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আসল বিস্ময় মজুত রয়েছে ধওলা সর্দারের বাড়িতে।

বাঁধের পাশে সরকারি জমিতে একখানা কুঁড়েঘর। তাতে দরজার বালাই নেই। একখানা ঝাঁপ ফেলা ছিল। ধওলা সর্দার ঠেলতেই ঝাঁপটা একপাশে পড়ে গেল। ঘরের যা অবস্থা তাতে মনে হল, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে কেউ বাইরে গিয়েছে। কেননা তেলচিটে মাদুরের ওপর পাতা কাঁথা আর বালিশ লক্ষ করলে বোঝা যায় দুজন মানুষ কিছুক্ষণ আগেও এখানে শুয়ে ছিল। তারা গেল কোথায় ?

নীলের এবার ভয় করতে শুরু করেছে। ধওলা সর্দারকে তার রহস্য-রোমাঞ্চের বইয়ের খলনায়ক মনে হচ্ছে। ছেলে আর ছেলের মাকে নিরুদ্দিষ্ট দেখে তার কোনও দুর্ভাবনা নেই। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। বরং তার কাছে এটা যেন একটা সহজ ব্যাপার।

কোনও কথা না বলে ধওলা সর্দার কাঠকুটো নিয়ে আগুন জ্বালার চেষ্টা করছে। দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে চাইছে সে। রাত এখন বেশি নয়। কিন্তু এখানে যেন সব কিছুই বেশি বেশি। শুধু মানুষ ছাড়া। অন্ধকারও খুব বেশি। খুব তাড়াতাড়ি এসেছে।

"তুমি রান্নার জোগাড় করছ ?"

"হ্যাঁ, খিদে পায়নি ?"

"না।"

"সে কী গো !"

"আমি খাব না।"

"কেন ? সারা রাত উপোস করে থাকবে ?"

নীল বলতে পারছে না, কেন সে খাবে না। কেন তার ভাল লাগছে না। সে তো আর বলতে পারে না, আমার পড়া গল্পের বইয়ের দুষ্টু লোকটার মতো তুমি। এখন তোমাকে চিনে ফেলেছি। তোমার দয়ামায়া নেই। আমি রাতে এখানে থাকব না।

ধওলা সর্দার নীলের মনের কথা জানে না। সে আগুন উশকে দিতে লাগল। চাল ফুটছে মেটে হাঁড়িতে। অদ্ভুত একটা গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে আছে। ধওলা সর্দার বলল, "লিল, হাত-মুখ ধুয়ে নাও।"

আট

আকাশের নীল রঙটা কেমন জ্যান্ত মনে হচ্ছিল। যেন ও নীল রঙেরও প্রাণ আছে। সামুদ্রিক হাঁস উড়ছে। নিচু আকাশে তারা নানারকম রেখা আর আকার গড়ে দেয়। দূরে একটা জাহাজ চলে যাচ্ছিল, পালা করে হাঁসের দল জাহাজের পিছু-পিছু যেতে লাগল। রবারের বলের মতো সাদা হাঁসের দল, ঢেউয়ের চুড়োয় একটু ছোঁয়া লাগিয়ে আবার উড়ে যাচ্ছে। এ খেলায় মেতে থেকেই তারা মাছও খুঁটে নিচ্ছে নীলচে জল থেকে।

বেল পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৩.২৫)

ত্বকে বাতাস পৌঁছতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশি

'বিমল' পলিনেট দিয়ে তৈরী বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠান্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না। বহু বার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশনদুরুস্ত দেখায়।

'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর—এ সবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে 'বেল্ পলিনেট নন্ স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল্-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন- কটন টেপ	১১.০০
২ x ২ রুবিয়া কটন টেপ	১৩.৫০*
কটন ইলাস্টিক টেপ	১৬.২৫
'বিমল' পলিয়েস্টার রুবিয়া	১৯.২৫
২ x ২ রুবিয়া ইলাস্টিক টেপ	২০.৫০*

*লাল, কালো, গোলাপী ও গায়ের রঙে পাওয়া যায়

belle

পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা

বেল্ ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪ বি সবারবান স্কুল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৫। ফোন: ৪৮-৩৭০৮

C 86-5 R

ডিলারদের নামের তালিকা

কলিকাতা: পূর্ণিমা, ডবলিউ/বি ২৬, ইন্টালি মার্কেট; যশোদা স্টোর্স, ১০৩ বি, বিধান সরণি; মডার্ণ ড্রেসেস, হাতিবাগান; কলেজ স্টোর্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট; এইচ এন্ড আর বণিক স্টোর্স, বালিগঞ্জ ফ্যান্সি মার্কেট; ফ্রেন্ডস স্টোর্স, ৭০/২০ রবীন্দ্র সরণি; শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ভান্ডার, বড়বাজার; বি এন্ড বি এন দে, 'জি ব্লক', নিউ মার্কেট; অংগশোভা, গড়িয়া; স্বর্ণময়ী, যাদবপুর; মীনাশ্রী, বেহালা। বীণা, ৩৪ জি টি রোড (দক্ষিণ) হাওড়া; সাহা ড্রেসেস, কদমতলা; সুমিতা, শ্রীরামপুর; তারক এম্পোরিয়াম, চুঁচড়া; পোদ্দার ক্লাউস হাউস, নৈহাটি; শ্রীগুরু বস্ত্রালয়, বারাসাত; করুণাময়ী, খাগড়া, বহরমপুর; ইভন্ ক্লথ স্টোর্স, কৃষ্ণনগর; সূর্যাকমল, কাঁথি; কৃষ্ণা ম্যাচিং সেন্টার, আসানসোল; জয়শ্রী, পুরুলিয়া; গৌরী ড্রেসেস, মালদহ; রামনারায়ণ হরিকিষণ, মেদিনীপুর; নিউ টিপটপ, গোলবাজার, খড়গপুর; রীণা ড্রেসেস, বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, শিলিগুড়ি।

"হাঁ করে কী দেখছ ? ওগুলো তারই মাছ। খেয়েছ কখনও ?"
নীল হেসে ফেলল, "নাম-ই শুনিনি।"
মওলা এখন তার পাশে এসে বসেছে। স্রোতের মুখে নৌকো ছুটে চলেছে, একটু-আধটু নাচছেও। নীল গলুইয়ে বসে একটা হাত জলে রেখেছিল। মওলা ওর হাতটা সরিয়ে দিল আলতো করে, "কামঠ আছে, এবার আমরা বাঁদিকে যাব, তারপর সামনের নদীটা দিয়ে কিছু দূর গেলে হাতানিয়ার জঙ্গল পাব। তার আগে খাঁড়িতে ঢুকতে হবে।"
মওলা যে ধওলা সর্দারের ছেলে সেটা বেশ বোঝা যায়। নীল এখন মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে। ছিঃ, ছিঃ, সে কিনা ধওলা সর্দারকে শয়তান ভেবেছিল। সারারাত নীল জেগে বসে ছিল। কিচ্ছু মুখে তোলেনি। ক্ষুধার্ত ধওলাও তাকে অভুক্ত রেখে খেতে পারল না। আবার পরে যখন নীল তার মনের কথা স্বীকার করেছিল, তখন ধওলা সর্দারও কম অবাক হয়নি। কী করে নীল ভাবতে পারল যে, ধওলা খুনি। কী করে ভাবতে পারল ধওলা নিজেই তার বউ ছেলেকে তাঁড়িয়ে দিয়েছে।
"তোমরা না ফিরলে কী যে হত।"
"কী আর হত, আমাদের অভ্যেস আছে।"
একটি পরিবারের হারিয়ে যাওয়ার অভ্যেস আছে, একথা নীলের জানার কথা নয়। আবার প্রথমটায় সে এ-ও বুঝতে পারেনি যে, মওলারা সবাই কাজ করে। তাতেই খেতে পায়। আর কে যে কখন কী কাজ করবে, কী কাজ জুটবে সেটাও ঠিক থাকে না। যে যখন যে কাজ পাচ্ছে, সে তাই করছে। তারা জানে কাজ শেষ হলে সবাই ঘরে ফিরবে। একবার বলা নেই, কওয়া নেই, মওলা চলে গিয়েছিল জম্বুদ্বীপে। সেটা শীতকাল। তখন ওখানে শুকনো মাছের কারবার। দু'মাস পরে একজন খবর দিল এসে মওলা জম্বুদ্বীপে আছে। সে ফিরল তিন মাসের মাথায়। সঙ্গে দু'খানা নতুন গামছা। একশো টাকা। আর শুকনো মাছের একটা পুঁটলি।
আবার তিনজনই যদি একসঙ্গে এমন কাজ পেয়ে যায়, যাতে অনেক দিন চলবে, তখন তাদের ঘরটাও চলন্ত ঘর হয়ে যাবে। যা পারবে নিয়ে নতুন জায়গায় চলে যাবে। সেখানে আবার চালা তুলবে। একবার তারা হাঁসখালিতে এভাবেই গিয়েছিল। সেখানে তখন বাঁধের কাজ চলছিল। মওলার বাবা-মা মাটি কাটত সেখানে।
নৌকোয় সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিটির একটা হাত কনুই থেকে নেই। এই লোকটি সুবলদা। নীলকে সঙ্গে নিতে চাইছিল না। একেবারে ভোরে মওলা আর তার মা ফিরে আসার পরই ঘটনাটা ঘটে।
মওলার মা দূরের এক গ্রামে গিয়েছিল ধানসেদ্ধ করার কাজ নিয়ে। মওলা গিয়েছিল বনে কাঠ কাটতে। পরের দিন ভোরে তারা যখন ফিরে এল, নীল তখন ঘুমে অচৈতন্য। ঘুম থেকে উঠেই তার ভুল ভাঙল। সে দেখল, ধওলা সর্দার তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসছে।
"কী, যাবে নাকি লিল ?"
"কোথায় ?"
"সুন্দরবনের নাম শুনেছ ?"
"হ্যাঁ, খুব শুনেছি, এটাই তো সুন্দরবন।"
"বন তো আর এখানে নয়, নৌকোয় করে যেতে হয়।"
"যাব।"
"তা হলে মওলাকে বলো।"

নয়

নিজের বয়সী আরেকটি ছেলের দিকে নীল খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল। কালো কুচকুচে ছেলেটির মুখে ঝকঝকে হাসি এমন আকর্ষণীয় যে, নীল চোখ ফেরাতে পারছিল না। তাকে বালকরাজা মনে হচ্ছিল। সে এমনভাবে হাসছে যেন এই বন, জল, আকাশের রাজা সে। তার অনুমতি ছাড়া এখানে কিছুই করা যাবে না। শুধু যা মুকুটটা নেই। 'মুকুটহীন সম্রাট' কথাটা সে ছাপার অক্ষরে দেখেছিল, এখন যেন সেই ধারণাটির একটি মূর্তি দেখতে পাচ্ছে। এ কোন্ দেশে এল নীল।
"তুমি আমাদের সঙ্গে খাটতে পারবে ?"
"কী কাজ ? কী করতে হবে বলো ?"
"তিন-চার দিনের ব্যাপার তো, চাল-ডাল সঙ্গে নেব, মিঠে জল নেব। সে-সব থেকে তোমাকে খেতে দেব। এখন কাজ করতে না পারলে তো আর এত খরচ পোষাবে না।"
"আহা, কাজটা কী বলবে তো ?"
"রাঁধতে পারো ?"
"না।"
"কাঠ কাটতে পারো ?"
"কখনও কাটিনি, তবে পারব মনে হয়।"
"না, অত সোজা নয়! কায়দা করে কাটতে না পারলে একটুতেই হাঁপ ধরে যাবে।
"তা হলে ?"
"উপায় অবশ্য একটা আছে। বোঝা বইতে পারো ?"
"পারি।"
"বেশ, তা হলে চলো।"
নীল জীবনে কখনও বোঝা বয়নি। কিন্তু সুন্দরবনে একটি

দুঃসাহসিক অভিযান চালানোর ইচ্ছে এতই জোরদার হয়ে উঠল যে, সে বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলল। কিন্তু শেষ বিপদ তখনও কাটেনি। ধওলা সর্দার নীলকে শুনিয়েই বলল, "মওলা, পুলিশের কথাটাও বলে দেওয়া উচিত।"

মওলারা কাঠ কাটার পাশ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুযোগ পেলে তারা মধুও সংগ্রহ করবে। কাঠ কাটার পাশ নিয়ে মধু সংগ্রহ করা বেআইনি। কিন্তু আইনের একটু এধার-ওধার না করলে সুন্দরবনের গরিব লোকদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। সবচেয়ে আগে হল বেঁচে থাকা। তা ছাড়া এ-কাজটাকে তারা চুরি মনে করে না।

নীল পুলিশের হাতে চুরির দায়ে ধরা পড়তে চায় না। আবার অ্যাডভেঞ্চারের এই সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়াও করতে পারছে না। সে দোটানায় পড়ে গিয়েছিল। তখন মওলা সর্দার বলল, "মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবো না, পুলিশের হাতে পড়লে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, বরং সহজে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে। তুমি তো আর উধাও হয়ে যেতে চাও না। বাড়িতেই তো শেষ পর্যন্ত ফিরতে চাও?"

নীল স্বীকার করল। হ্যাঁ, সে তাই চায়। কিন্তু ফেরার আগে সে নিজেকে কিছু অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী করে নিতে চায়। যে-সব ঘটনা আকছার ঘটে না। যেমন, এই বনে কাঠ আর মধু আনতে যাওয়া। স্কুলের কটা ছেলের এই অভিজ্ঞতা আছে? আর ক'জনেরই বা সাহস আছে নীলের মতো এইরকম হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাওয়ার। হোক না এক সপ্তাহের জন্য। তাই বা ক'জন পারে?

যদিও ধওলা সর্দার রাজি হয়েছে মৈপিঠে যেতে। সে মাস্টারমশাইকে জানিয়ে আসবে নীলের অন্তর্ধান-রহস্য। এও বলে আসবে যে, মাস্টারমশাইদের এখানে থাকার দিন শেষ হওয়ার আগেই নীল মৈপিঠে ফিরে আসবে। সর্দার নিজেই তাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

দশ

বনবিবির দোয়া। বনবিবির থান। বনবিবির সন্তান। কে এই বনবিবি? সে কি দেবতা? কই, নীল এত দেবদেবীর নাম শুনেছে, বনবিবির নাম কখনও শুনেছে বলে মনে পড়ে না। খাঁড়ি ছাড়ানোর আগেই দেখা গেল জঙ্গলের মুখে লাঠি পোঁতা। সেখানে পতাকার মতো শার্টের টুকরো উড়ছে। তা দেখে মওলাদের দল আরেক দফা বনবিবির দোয়া চেয়ে নিল।

নীল জিজ্ঞেস করায় মওলা তো হেসেই খুন। কী আশ্চর্য ব্যাপার, নীল কিনা বনবিবির নামই শোনেনি। ছেলেটা কোন দেশে থাকে! "বনবিবিকে জানো না? বনের দেবতা। এখানকার পশুপাখি, জীবজন্তু, জল, আকাশ-বাতাস-মানুষ সবাই তাঁর সন্তান। বনবিবি সবাইকে রক্ষা করেন। বনবিবির দোয়া নিয়ে বনে ঢুকলে বিপদ-আপদ পালায়। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি বনে ঢুকে বনবিবির সন্তানের গায়ে হাত দাও, তা হলে রায় দখিনা রায়ও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

"সে আবার কে?"

"কার কথা জিজ্ঞেস করছ?"

"ওই যে রায় দক্ষিণ না কী বললে?"

"সে-ও দেবতা দক্ষিণ রায়।"

যেখানে নীলরা নৌকো থেকে নামল, সেটা হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার জঙ্গল। মওলা বলল, ওই জঙ্গলের ভিতরে, অনেক ভিতরে নাকি একটা কালীমন্দির আছে। দুর্গাপুজোর পর অমাবস্যায়, প্রতি বছর ওখানে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে। দূরের গ্রাম থেকে সেই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

নীল আপত্তি করে বলেছিল, "কী করে বুঝবে যে এই মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টাই বাজছে, সেদিন তো অনেক পুজো হয়।"

শুনে মওলা শুধু বলেছিল, "বোঝা যায়।" তার কথার মধ্যে ঘোরতর রহস্য ছিল। সে রহস্য এই জলজঙ্গলের। এখানে সবকিছুই যেন আলাদা। এখানকার নিয়ম-কানুন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। নীলের সৌভাগ্য যে শুধু ভাষাটা মোটামুটি এক। না হলে একই দেশের এ-দুটি অংশ, কলকাতা ও সুন্দরবনে বিন্দুমাত্র মিল নেই। যেন দুটো আলাদা দেশ।

আর কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর তারা নৌকো থেকে নামল। নেমেই মাটিতে হাত ছুঁইয়ে কপালে ঠেকাল। যার হাত বাঘে খুবলে দিয়েছিল, তার হাতে একটা লাঠি ছিল। সে গুনিন। ওই লাঠি মাটিতে ঠেকিয়ে কী সব মন্ত্র পড়ে নিল সে। তারপর কুড়ুল আর কয়েকটা লাঠি নিয়ে দলটা এগোতে লাগল।

তারা আরও আগে নামতে পারত। কিন্তু যেখানে ছেঁড়া শার্ট উড়ছিল ওই জায়গাটা তারা এড়িয়ে যেতে চায়। কারণ ওটা একটা চিহ্ন। কিছুদিন আগেই ওখানে কাউকে বাঘে নিয়েছে। এখানকার মানুষ বাঘের কবলে পড়লে সঙ্গীরা জায়গাটায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখে। তার থেকে বোঝা যায়, এই এলাকাটা কোন বাঘের সীমানার মধ্যে পড়ে। নীল বইয়ের সঙ্গে, ছাপার অক্ষরের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করল মনে-মনে — অর্থাৎ সুন্দরবনের কাঠুরে এবং মধু-সংগ্রাহকরা ফেরোমেনের ব্যাপারটা আলাদা ভাবে না জানলেও তাদের বাস্তববুদ্ধি জিনিসটা ধরে ফেলেছে। আবার তারা জিম করবেট না পড়েও জেনে ফেলছে নানা কারণে যে-বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়েছে সে আর এই সহজতম শিকার ছেড়ে খাবারের চেষ্টায় কষ্টকর কোনও কাজে হাত দেবে না। সব মিলে তাদের এই সতর্কতা।

পাড় থেকে বনকে যেমন মনে হয়েছিল তা নয়। বন সর্বত্র সমান ঘন নয়। এমনকী মাঝেমধ্যে ফাঁকা মাঠের মতো কিছুটা জায়গা পড়ে আছে। জীবজন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পেলেও নীল ঠিক বুঝতে পারছিল না কোনটা কিসের ছাপ। কাঠুরের দল বেশ হল্লা করতে করতে চলেছে। মাঝেমধ্যে থেমে জায়গাটা দেখে নিচ্ছে। চারপাশ থেকে বনের আর মাটির অদ্ভুত একটা গন্ধ উঠছে। বাতাস এখানে এত তাজা যে, নীলের নাক সামান্য জ্বালা করছিল।

মওলারা কিছু দূর হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এল খানিকটা। ডান দিকে নালার মতো একটা নদী বইছিল। তারা সেখানেই চারপাশে গাছ কাটতে আরম্ভ করল। ছোট-ছোট জংলা গাছই তাদের কাটার কথা। কিন্তু তাতে আর কী রোজগার হবে। সেজন্যে মাঝেমধ্যে বেশ মোটাসোটা গাছের ডালও তারা কেটে নিচ্ছিল। নীল তাই ছাপার অক্ষরের জ্ঞান নিয়ে যথেষ্ট ঘাবড়ে গেল। বন এভাবে কাটা কি ঠিক? দেশের মানুষই যদি

এভাবে বন কেটে নেয় ! সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল এদের ঘরদোরের কথা। বুঝতে পারল, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু এভাবে চললে তো···নীল ভেবে কূল পায় না।

এগারো

ফেরার পথে নীল সুবলদাকেই জিজ্ঞেস করল কথাটা। সুবলদা সব শুনে বলল, "দ্যাখো বাবা, জল-জমি-বন সব আগে থেকে ভাগ করা আছে। বনে বাঘ পশু-পাখি থাকবে। জলে থাকবে মাছ আর জলের প্রাণীরা। সুন্দরবনে এই ছিল আদি ব্যবস্থা। তারপর লাট হল। সেটা ইংরেজ আমল। তখন এখানে জেলের কয়েদিদের মুক্ত করে পাঠান হত। তারা যে যতটা বন কেটে আবাদ গড়তে পারবে, সেইমতো জমি পাবে। অনেকে বাঘের পেটে গেল। রোগে মরল। সাপে কাটল। ফাঁসির দড়ির বদলে তবু বাঁচার চেষ্টাটা তো মানুষ পছন্দ করবেই। যাই হোক, এভাবে বসত গড়ে উঠল। তারপর লাট-বন্দোবস্তে জমিদারি দেওয়া হল। খাজনা চালু হল। এই অবধি ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি। তা গাছ তো বাবা আজ থেকে কাটা হচ্ছে না।"

"কিন্তু···"

"হ্যাঁ জানি বাবা, গাছ কাটলে জমি থাকবে না, বন্যা হবে, বাঘও বেরিয়ে আসবে।"

"তা হলে ?"

"আমরা আর কতটুকু কাটি, আসল চোররা তো বন কেটে কবেই বড়লোক হয়ে গেছে, কলকাতায় তাদের বাড়ি-গাড়ি আছে।"

নীল ক্রমেই নানারকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে থাকে। এর একটাও যে কেন সোজা নয়, সব কিছু এত জটিল কেন। নদীর গতির মতোই এঁকে-বেঁকে এক জটিল নকশায় যেমন এই দ্বীপগুলো ধরা আছে, যেন তেমনই এখানকার সমস্যাগুলো আরও অনেক অদৃশ্য নদীর গতিপথে পৌঁছে গেছে কলকাতা পর্যন্ত। এরাও জানে না। এরা কলকাতাকে ভয় করে। ভক্তি করে। কিন্তু কেন এত ভয় সে রহস্যের কোনও সমাধান নেই। বাঘের থেকে তারা বনবিভাগের কর্মচারীকে ভয় করে। ফেরার সময় জোয়ার দেখে, খাঁড়ির পর খাঁড়ি উজিয়ে, মাঝে-মাঝে কিছুক্ষণ খাঁড়ির ভেতর নৌকো লুকিয়ে রেখে, ফেরার রাস্তাটাকে তারা আরও লম্বা করে তুলল। আর এসবই করল বনবিভাগের সরকারি স্পিডবোটের ভয়ে।

তারা সামুদ্রিক পাখির মতো, কুবো কাঁকড়ার দুরন্ত গতির মতো দিনভর কাজ করছে, কাজ খুঁজছে। তবু তারা এত ভয় পায় কেন ? মওলা কত কাজ করতে পারে। নীল তো কিছুই করতে পারে না। অথচ নীল আর মওলা একবয়সী। মওলাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, 'তুমি বড় হয়ে কী করবে ?' কেননা মওলা সব সময়ই বড় হচ্ছে, সে বড় হয়েই আছে। তার হাত দুটো কাজ করছে। কাঠের বোঝাও শেষপর্যন্ত মওলাকেই বইতে হয়েছিল। তা হলে এত রকমের কাজ করতে পারা কি খারাপ ? অন্যায় ? "মওলা, তোমার কী করতে বেশি ভাল লাগে ?"

"কী করতে ?"

"হ্যাঁ।"

"নৌকা বাইতে।"

"আর ?"

"মাছ ধরতে।"

"আর ?"

"আর গাছ দেখতে।"

"গাছ দেখতে ?"

"হ্যাঁ, আমি দেখাব তোমাকে, কত রকমের ছোট-ছোট গাছ হয়, নানারকমের সব পাতা, রঙও কত রকমের। সূর্যের দিকে মুখ করে আছে কেউ, কেউবা জলের ধার ছেড়ে নড়বেই না। আমি গাছের সঙ্গে কথা বলি।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

বারো

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বইয়ের ওপর নীলের মুখ। সে যেন পরম আরামে বইয়ের গন্ধ শুঁকছে। মাতলার জল ভেঙে পড়ছে লঞ্চের গায়ে। বিমলবাবু নীলের পিঠে হাত রেখে বলছেন, "সত্যি রে নীল, হারিয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা।"

নীল বিমলবাবুর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, "ভয় নেই, তোমার বাবা-মাকে জানাব না।" সুইনহো স্ট্রিট থেকে আবাদ ভগবানপুর সত্যি কতটা দূরে, নিজের পড়ার ঘরে বসে নীল ভেবে চলেছে।

"কী রে নীল ? তোর হল ? এ কী রে, তুই ঘুমোচ্ছিস ?"

"মোটেই না।"

"তা হলে কী করছিলি ?"

"ভাবছিলাম।"

"ভাবছিলি, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ?"

"নিমাটোফাইকাস উদ্ভিদ নিয়ে ভাবছিলাম। বইতে লিখেছে ওই গাছ আর দেখা যায় না। আমি দেখেছি।"

"কে দেখাল তোকে ?"

"মওলা।"

"সে আবার কে ?"

"প্রোফেসর মওলা, একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী।"

"তোদের স্কুলে কি আজকাল সাহেবসুবোও আসছে ?"

"ইয়েস।"

ছবি : প্রবীর সেন

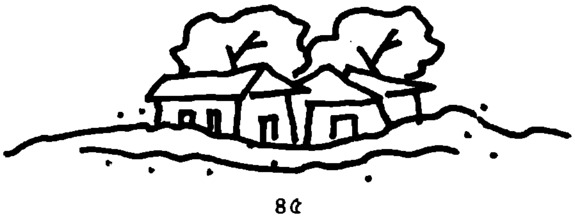

জেনে নাও

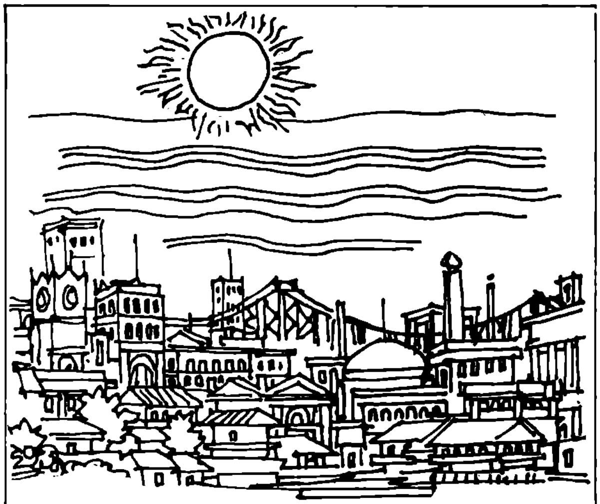

সকাল-বিকেলের চেয়ে দুপুরে গরম বেশি কেন

শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, দিনের মধ্যে দুপুরবেলাতেই বেশি গরম লাগে। সকালে নয়, বেলা পড়ে এলেও নয়। এই যে দুপুরবেলায় দিনের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি গরম লাগে, এর কারণ কী?

আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে একটা বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু এর ঘনত্ব বরাবর সমান নয়। ভূ-পৃষ্ঠের কাছে এই বায়ুমণ্ডল যতটা ঘন, ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে উপুর দিকে তার চেয়ে কম। ফলে ভোরে দিগন্ত ছাড়িয়ে ওঠার সময়ে বা গোধূলিতে দিগন্তের আড়ালে নামার বেলায় সূর্যকে বাতাসের যতটা ঘন স্তর পার হয়ে আসতে হয়, তেমন আর অন্য কোনও সময়ে হয় না। দুপুরবেলাতেও নয়। দুপুরে সে মাথার ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু তখন যে বাতাসের স্তর পার হয়ে সে পৃথিবীতে আসে, সকাল-সন্ধের মতো তা সব জায়গায় অতটা ঘন হয় না।

উষ্ণতা যখন ঘন বস্তু পার হয়ে আসে, তখন সেই ঘন বস্তুর মধ্যে উষ্ণতার অনেকটা শোষণ হয়ে যায়। সেইজন্যে তাপ হ্রাস পায়। কিন্তু যেখানে বস্তু তেমন ঘন নয়, সেখানে উষ্ণতার শোষণ কম। ফলে তাপের তেমন হ্রাস লক্ষ করা যায় না। কাজেই সকাল-বিকেলের চেয়ে দুপুরে গরম বেশি লাগে।

দুপুরে গরম বেশি হওয়ার আরও একটা কারণ আছে।

দুপুরবেলায় সূর্য মাথার উপরে থাকে বলে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে সরাসরি। কিন্তু সকালে ও বিকেলে পড়ে তেরছাভাবে।

সূর্যরশ্মি তেরছাভাবে পড়লে কী হয়?

সরাসরি এলে যতগুলো রশ্মি যতটা জায়গায় পড়ে, তেরছাভাবে পড়লে ততগুলো রশ্মিই তার চেয়ে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উষ্ণতা বাড়েনি, কিন্তু জায়গা অনেকটা ছড়িয়ে গেল। তাতেও গরম কম লাগে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ডাক্তারবাবু বলছেন

গরম পড়ছে, সাবধান

এবার গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। তাই সাবধান হতে হবে। গরমকালে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি হয় আন্ত্রিক রোগ, আর অতিরিক্ত গরমের জন্য হিট্‌স্ট্রোক হতে পারে, সর্দিগর্মিও হতে পারে, সেইজন্য এখন থেকেই রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করবে না। স্কুলে যাবার সময় ছাতা ব্যবহার করবে।

টিফিনের সময় রোদে ঘুরে হুটোপাটি করবে না। যেখানে ছায়া আছে, সেখানে খেলাধুলো করবে। এখনকার রোদ একটু একটু করে সইয়ে গায়ে লাগাবে। ছুটোছুটি করবে না। বেশি ছুটোছুটি করলে ঘেমে যাবে, সেই ঘামে জামাকাপড় ভিজবে। গায়ের ঘাম গায়েই শুকোবে। আর এই ঘাম গায়ে শুকিয়ে ব্রঙ্কাইটিস-এর মতো রোগ হতে পারে। তা ছাড়া ছুলি, চুলকোনি, হাজা ইত্যাদি নানা চর্মরোগও ঘাম শুকিয়ে হয়। তাই একটু সাবধানে থেকো।

যারা খেলাধুলো করো না, বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে বিশ্রাম করবে। গল্পের বই পড়বে, ছবি আঁকবে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করবে। তারপর ক্লাসের ঘন্টা পড়লে আবার ক্লাসে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। সকালবেলায় একবার ব্যায়াম করছ, আবার দুপুরবেলায় যদি ছুটোছুটি করো, তা হলে ব্যায়াম বেশি হয়ে যাবে, আর ক্লান্তও হয়ে পড়বে।

এই সময় থেকে রোজ সকালে এক গ্লাস জল নুন-চিনি মিশিয়ে শরবত করে খাবে, তাতে শরীরের ক্লান্তি অনেক কমে যাবে। যদি মনে করো, তা হলে সকালে আর সন্ধ্যায় এক গ্লাস করে শরবত খাবে।

রোজ যেমন খাবার খাচ্ছ, তেমনি খাবে। এখন থেকে অতিরিক্ত ঝাল-মশলা দেওয়া গুরুপাক খাবার খাবে না। ভাজাভুজি খাবারও এখন থেকে খাওয়া কমিয়ে দেবে। স্কুলে বাড়ি থেকে ফুটোনো জল নিয়ে যেতে আরম্ভ করবে। জল যেন দশ থেকে পনেরো মিনিট ফোটে, তার চেয়ে কম ফুটলে রোগের জীবাণু মরবে না।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

হাতে-কলমে

অনিরুদ্ধ কর

ফরেনসিক কেমিস্ট হিসেবে নিশানাথবাবুর নামটাম হয়েছিল। পুলিশের সদর দফতরের সঙ্গে তাঁর বেশ যোগাযোগও গড়ে উঠেছিল। অপরাধ এবং অপরাধীদের ফেলে-যাওয়া কোনও তুচ্ছ সূত্রের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে, রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তিনি বের করে দিতেন অনেক গোপন তথ্য, যা নাকি তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের খুব দরকারে লাগত।

এহেন নিশানাথবাবুর মাথায় কেন যে অমন উদ্ভট খেয়াল চাপল, তা বোঝা ভারী মুশকিল।

নিশানাথবাবু তিন খণ্ডের একখানা পেল্লায় বই লিখতে বসে গেলেন। বিষয়, 'পকেটমারদের রীতিনীতি'। এটা শেষ হলে নাকি কেপমারি ও চুরির ওপরও তিনি বই লিখবেন। তাঁর ল্যাবরেটরির কাজ এখন শিকেয় উঠেছে। কুখ্যাত সব পকেটমারের সঙ্গে তিনি এখন উঠছেন বসছেন আর ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।

অবশ্য এই বই লেখার ব্যাপারেই তাঁকে মাঝেমধ্যে লালবাজারে যেতে হচ্ছে। কোন্-কোন্ এলাকায় বেশি পকেটমার হয়, সে-সম্পর্কে একটা ম্যাপও থাকবে কিনা বইটায়। এজন্য তথ্য জোগাড় করতেই পুলিশ দফতরেও তাঁকে যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

নিজে বৈজ্ঞানিক বলেই নিশানাথবাবুর বইটায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে পকেট মারার ব্যাপারটা লেখা হচ্ছে। সূচিপত্র দেখলেই বোঝা যায় যে, এই বইতে বিশেষ ওই অপরাধের সব দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

পকেট মারার সময় একজন পকেটমার কেমন পোশাক পরে, তার মুখের ভাব কেমন থাকে, কোন্ অবস্থায় তাকে কোন্ কৌশল অবলম্বন করতে হয়, এইসব বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁর বইতে থাকছে। এমনকী পকেটমারের ফিজিক্যাল ফিটনেস্, মার খাওয়ার ক্ষমতা, দৌড়বার দক্ষতা, মায় গল্প করে লোকের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার কায়দা পর্যন্ত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে।

সবকিছুই ঠিকঠাক এগোচ্ছে। বইটার প্রথম খণ্ডের ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এল বলে। কলকাতার প্রথম পকেটমার হীরালালকে উৎসর্গ করা হয়েছে বইটা। হীরালাল নাকি লর্ড কর্নওয়ালিসের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং ফাঁসিতে মারা যায়। নিশানাথবাবু হীরালালকে রীতিমত বীরের সম্মান দিয়েছেন। কারণ, ইংরেজের অন্যায়ভাবে ভরে-ওঠা পকেটের বিরুদ্ধে সে ওইভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল! কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছেন কলকাতা পুলিশের একজন ডি· সি· মানে ডেপুটি কমিশনার। ওই ডি· সি· নিশানাথবাবুকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, একজন কেমিস্ট কখনওই পকেটমার-বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। সবুজ কালিতে লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে ডি· সি· হাসেন আর বলেন, "আপনার সবকিছুই এই রকম সবুজ, মানে কাঁচা। হ্যাঁ, হত টেরিটিবাজারের কাল্লু, আমি মেনে নিতাম। এই কাজে কাল্লুর অভিজ্ঞতা কত বেশি!"

নিশানাথবাবু তবু হাল ছাড়েন না। ডি· সি·কে দিয়ে একটা ভূমিকা লিখিয়ে নেয়া যে বড্ড দরকার। পকেটমারদের দমন করার বিভাগটা উনিই দেখাশোনা করেন যে। তাঁর ভূমিকার বেশ দাম আছে।

ওঠার সময় নিশানাথবাবু বললেন, "কাল একবার আসব স্যার। ভূমিকা কিন্তু আপনাকে লিখে দিতেই হবে।"

একটু পরেই নিশানাথবাবু মত পালটে নতুন একটা মতলব ভেঁজে আবার ডি· সি·র ঘরে ঢুকলেন। তিনি যেতেই ডি· সি· বললেন, "আবার এলেন যে! ওসব পুঁথি-পড়া ফিচারের জন্য আমি কিন্তু কিচ্ছু লিখতে পারব না। আপনার তো মশাই কোনও অভিজ্ঞতাই নেই এই বিষয়ে। আপনি তো একজন কেমিস্ট, রাসায়নিক, তাই না!" বলে হা-হা করে ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন।

নিশানাথবাবু বিনীতভাবে বললেন, "না স্যার, সেজন্য না। আমার কলমটা ফেলে গেছি। তাই নিতে এসেছি।"

"কলম? নাহ্, কোনও কলম তো আপনি ফেলে যাননি?"

"ওই যে স্যার, আপনার পকেটেই শোভা পাচ্ছে আমার কলমটা।"

ডি· সি· কলমটা তুলে দেখে চমকে উঠলেন, "এ কী, আমার কলম তো নয় এটা। আমারটা কোথায় গেল?"

নিশানাথবাবু মুচকি হেসে বললেন, "লিখেই দেখুন না। সবুজ কালি, যে কালিতে এই পাণ্ডুলিপিটা লেখা হয়েছে।"

ডি· সি· কাগজে আঁচড় কেটে আরও অবাক হয়ে বললেন, "তাই তো। কিন্তু আমারটা?"

নিশানাথবাবু অবিচলিতভাবে বললেন, "ভূমিকাটা যদি লিখে দেন এক্ষুনি আপনার কলমটা এনে দিতে পারি।"

"কীভাবে?" প্রায় আঁতকে উঠে ডি· সি· জিজ্ঞেস করলেন।

"যেভাবে আমার কলমটা আপনার পকেটে গেছে।" নিশানাথবাবু বললেন।

"মানে?" চাপা চিৎকার করলেন ডি· সি·।

"হাতসাফাই, আমার বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে হাতে-কলমের অংশে এর পুরো কৌশলটা লেখা হয়েছে।"

ডি· সি· চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বললেন, "তবে কি আরও একজন বাড়ল!"

তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ভূমিকা লিখে দেননি। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পরামর্শেই নিশানাথবাবু কাল্লুকে দিয়ে বইয়ের ভূমিকা লেখাচ্ছেন।

ছবি: দেবাশিস দেব

এবার এলো

ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি

নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান
যা বাড়তি তেল দূর করে দিয়ে আপনাকে দেয়
এক পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল, রংরূপ !

নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান...ঠিক এমন সাবান দিয়ে আপনি আগে কখনো স্নান করেন নি। কারণ, অন্যান্য সাবানের থেকে আলাদা এই নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবানের অফুরন্ত ফেনা আর বহুক্ষণ থেকে যাওয়া সুগন্ধ আপনার ভালো লাগবে তাই নয়...তার সাথে আপনার ত্বককে ক'রে তুলবে আরো সতেজ !

কারণ, এর বিশেষ উপাদান ও অফুরন্ত ফেনা আলতো ভাবে ধুয়ে দেয় আপনার রোমকূপে জমা বাড়তি তেল, যাতে আপনার ত্বককে দেখায় আগের থেকে আরো পরিষ্কার ও ঝকঝকে আর ত্বকে ফুটে ওঠে ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি !

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান

OBM/5428/BEN

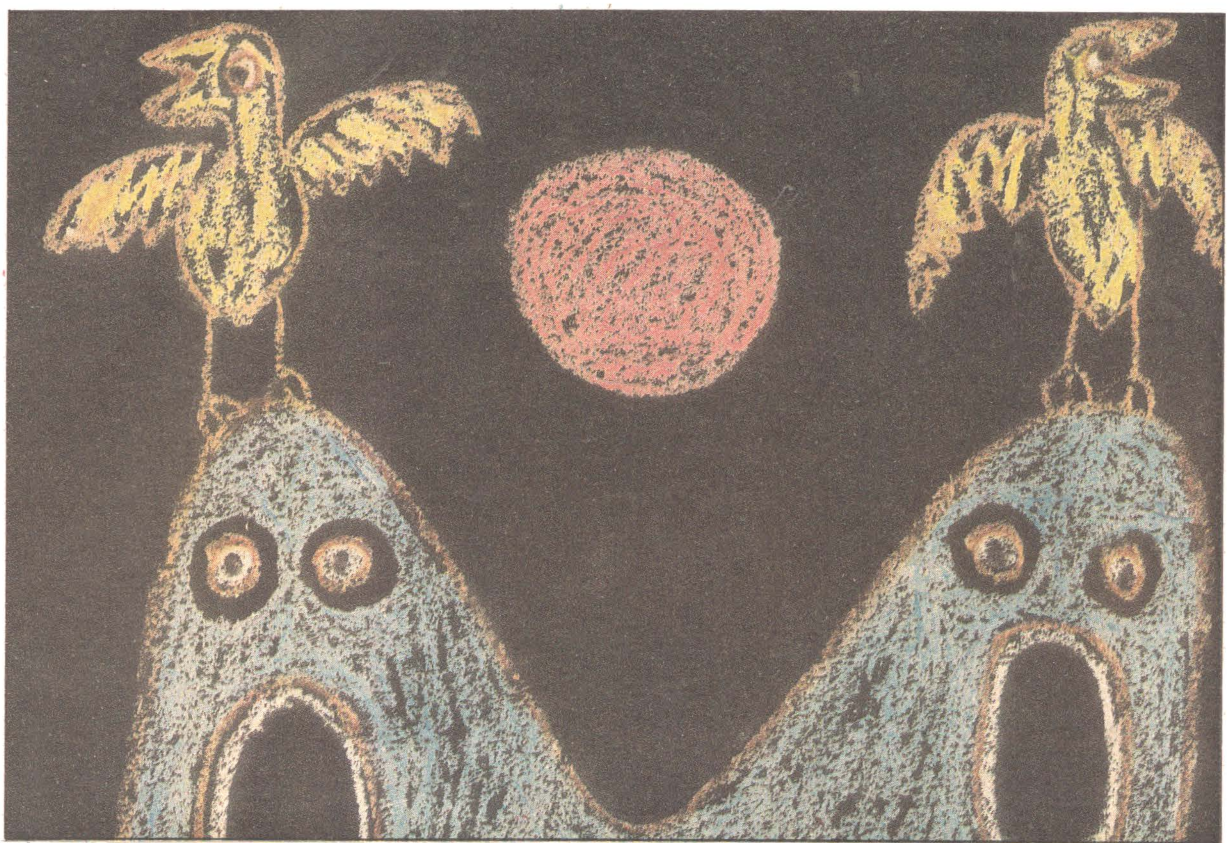

ছবি এঁকেছে **তন্ময় সামন্ত** (বয়স ১২)

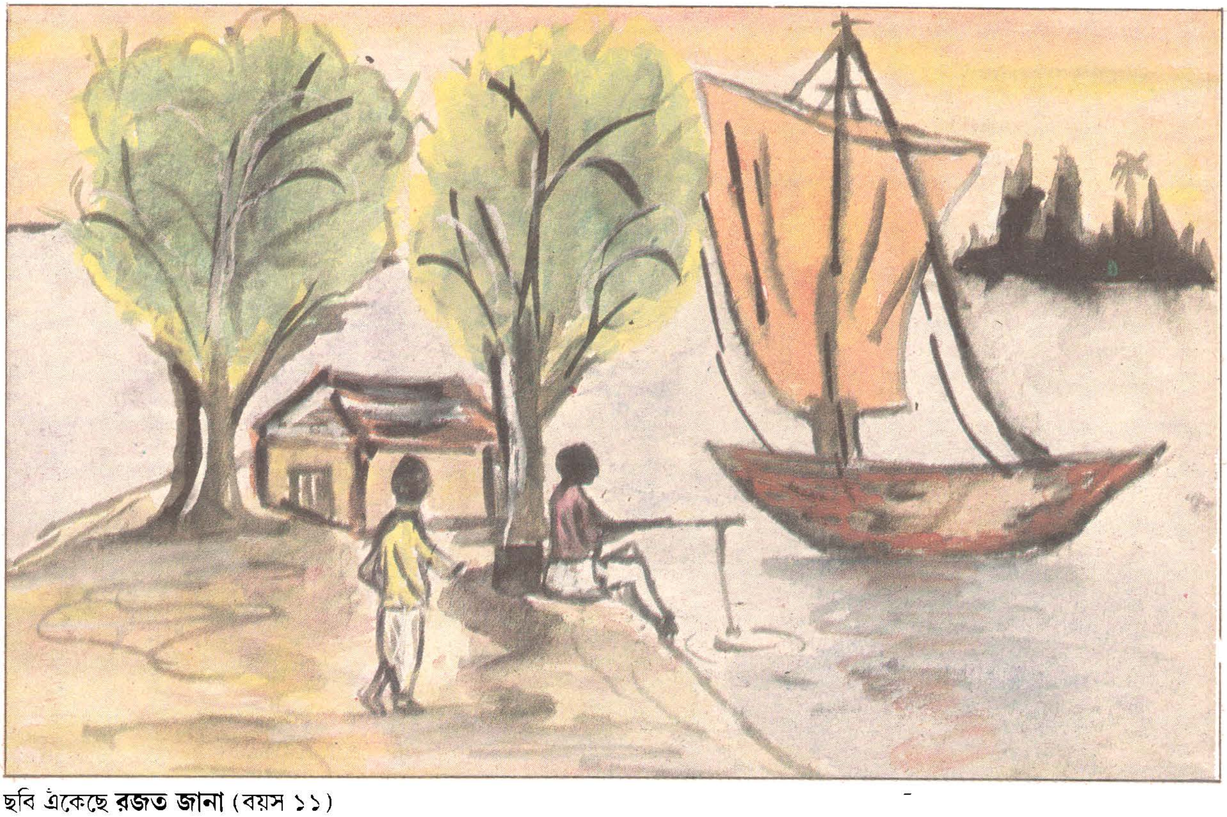

ছবি এঁকেছে **রজত জানা** (বয়স ১১)

এক যে ছিল

এক যে ছিল বুড়ি
সে খেত শুধু মুড়ি
থাকত মাটির বাড়িতে
রাঁধত মস্ত হাঁড়িতে
অর্পণ মিত্র (বয়স ৬)

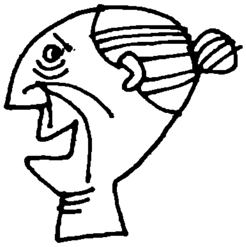

এমন দিন

এমন দিন কি আসবে ?
এই দেশেরই সব ঘরেতে সবাই শুধু হাসবে ?
পেটটি পুরে ভাতটি খাবে
পরিশ্রুত জলটি পাবে,
আলো-হাওয়া সব ঘরেতে উদার হয়ে খেলবে ?
শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ কিছুই নাহি রবে,
সবুজ ঘাসের মাঠগুলি সব পেলব স্নেহ দেবে,
চিকিৎসকে যেচে এসে রোগীর খবর নেবে
সময়মতো ওষুধ দিয়ে জীবনটি বাঁচাবে ?
সকল ঘরে সকল মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলবে,
স্বাস্থ্যেভরা শরীরগুলি একসাথে সব খাটবে ?
কোনও শ্রেণী থাকবে নাকো, 'মানুষ' শুধু রইবে
সেই মানুষের সকলেরই সমাজমূল্য থাকবে !
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-দলাদলি সবই ঘুচে যাবে
পারস্পরিক প্রীতিবোধে সবাই বাঁধা থাকবে !
এমন দিনটি আসবে কবে
সবাই যেদিন হাসবে ?
এমন দিন কি আসবে ?
মালিনী মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

সবাই আমার

সবাই আমার ভাই
সবাই আমার বোন
হোক না সে বড় মানুষ
হোক না হরিজন।
থাকবে না জাতিভেদ
থাকবে না বিবাদ
সবারে ভালবেসে
ঘুচাব অপবাদ।
মধুরিমা ভট্টাচার্য (বয়স ১০)

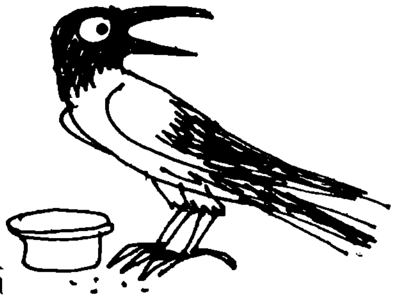

কাকের বুদ্ধি

রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে মামণি দুটো কুকুরকে ভাত খেতে দেন। ওরা আমাদের বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে।

বাড়ির সামনে একটা কৃষ্ণচূড়াগাছে দুটো কাকের বাসা। একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে বারান্দায় বসে রোদ পোহাচ্ছি, মামণি এসে কুকুর-দুটোকে ভাত দিলেন। কুকুরদুটো কিছুটা খেয়ে রোদে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাক-দুটো উড়ে এল বাকিটা খাবে বলে। কিন্তু যেই না এসেছে কুকুর-দুটো প্রচণ্ড ঘেউ-ঘেউ করে ওদের তাড়িয়ে দিল। কাক-দুটো ভয় পেয়ে উড়ে গেল, কিন্তু লোভ ছাড়তে পারল না।

কুকুর-দুটো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওদের খাবার কোনও আশাই নেই। কাক-দুটো অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপব নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে নিল।

একটু বাদে কাক উড়ে গিয়ে একটা কুকুরের পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা মোক্ষম ঠোক্কর লাগাল কুকুরটার লেজে। আর কুকুরটা কিছু বোঝার আগেই উড়ে গেল। কুকুরটা চমকে উঠে ছুট লাগাল। বাকি কুকুরটার কপালেও জুটল কাকের ঠোক্কর। সেও ছুটে পালাল।

কাক দুটো তখন মনের আনন্দে ভাত খেতে বসল। ওদের বুদ্ধি দেখে আমি তো অবাক !

শান্তনু সেন (বয়স ১২)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুকে সে একটা পুরনো চাবি দিয়ে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ ; তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি আর আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের লোকেরা পৃথিবীকে চুরি করতে চায়। হরিবাবু ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরিতে একটা গোলকের খোঁজ পেয়েছেন। আর আংটি জেনেছে, মহারাজা আর কেউ নন, ভিন্-গ্রহের মহাশক্তিধর রামরাহা। গোলক-হাতে বেরিয়ে হরিবাবু ইতিমধ্যে ভিন্-গ্রহের মানুষদের জাহাজে বন্দী হন। সেখানে তাঁর পরিচিত অনেকেও আছেন। রামরাহা ওদিকে ঘড়িকে জানায় যে, শক্তির উৎস রয়েছে শত্রুদের জাহাজে। তারপর···

দানবের মতো লোকগুলো তাদের দ্রুত ও অতিশয় শক্তিশালী খনক দিয়ে মাটির নীচে যে-সব গর্ত করে ফেলল, সেগুলো বহু মাইল গভীর। খনকগুলোর সঙ্গেই লাগানো রয়েছে চার্জ। বহু দূর থেকে বেতার-তরঙ্গের সঙ্কেতে সেগুলোকে সক্রিয় করা যায়। বিপুল এক উথাল-পাথাল শক্তিতে আলোড়িত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর উথলে উঠবে। তারপর ভারসাম্য নষ্ট করে কক্ষচ্যুত টালমাটাল করে দেওয়া হবে পৃথিবীকে। সূর্যের বিপুল আকর্ষণ থেকে তার কোনও গ্রহকেই বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। মানুষের বিজ্ঞানে তা একরকম অসম্ভব। কিন্তু পৃথিবী নিজেই যদি মহাকাশযানে পরিণত হয়ে ছুটতে থাকে, তবে তাও সম্ভব। দানবেরা পৃথিবীর গভীরে চার্জ ঢুকিয়ে সেই ব্যবস্থাই করে রাখল। পৃথিবী যখন ছুটতে থাকবে সৌরলোকের বাইরে, তখন এক অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তাকে। কক্ষচ্যুত হলে প্রথম ধাক্কাতেই সমুদ্রে উঠবে বিপুল জলোচ্ছ্বাস, দেখা দেবে প্রবলতম ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত। জীবজগৎ একরকম শেষ হয়ে যাবে তখনই। সৌরলোকের বাইরে পৌঁছলে উবে যাবে পৃথিবীর আবহমণ্ডল, কঠিন বরফের মৃত্যুহিম মোড়কে ঢেকে যাবে চরাচর। গ্রহটি পরে ফের নিজেদের বাসযোগ্য করে নেবে দানবেরা। তবে তখন আর সেটা এই পৃথিবী থাকবে না। এইসব গাছপালা, পাখি, জীবজন্তু, মানুষ, কিছুই না।

রামরাহা হাতের মিটারটার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছোট্ট কিন্তু বিপুল শক্তির আধার একটি রহস্যময় যন্ত্র এই অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটাচ্ছে। কিংবা যন্ত্রটাকে বলা যায় প্রতিশক্তির আধার। কাছাকাছি যত শক্তির উৎস আছে যন্ত্রটা ঠিক তার বিপরীত ধর্মে কাজ করে যায়। শক্তি ও প্রতিশক্তির সংঘাতে সৃষ্টি হয় একটা নিউট্রাল শূন্যতা। এরকম যন্ত্র রামরাহার অগ্রজ বিজ্ঞানীও আবিষ্কার করতে পারেনি। এই পুরনো আমলের গ্রহে একজন মানুষ কী করে বানাল এরকম জিনিস? তার চেয়েও বড় কথা, এ-যন্ত্র ব্যবহার করাও বড় সহজ নয়। কিন্তু কেউ সত্যিই সেটাকে কাজে লাগাচ্ছে। হয়তো আনাড়ির মতো। কিন্তু ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে যন্ত্রটা অনেক অসম্ভব সম্ভব করবে।

রামরাহার অত্যন্ত হিসেবি মন জীবনে এই প্রথম একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। ইচ্ছে করলে সে এখনই বিপন্ন পৃথিবী থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর এক মহাসাগরের তলায় তার মহাকাশযান তৈরি আছে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে মহাকাশযানে করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সহজ। আর যদি সে পৃথিবীকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, তবে সেই কাজে বিপন্ন হবে তার প্রাণ। শেষ অবধি হয়তো পৃথিবীও বাঁচবে না, সেও নয়। তবে সে যদি ওই যন্ত্রটা হাতে পায়, তা হলে কোনও কথাই নেই।

রামরাহার দ্বিধাটা রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সে স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। তাকে একটা কাজই করতে হবে। ওই ছোট্ট ছেলেটিকে তার প্রিয়জন সহ কিছুতেই সে মরতে দেবে না। সুতরাং রামরাহাকে ওই দানবদের আকাশযানে উঠতে হবে। দানবদের হাতে ধরা দিতে হবে।

"জানুস!"

সেই লম্বা লোকটা অবিকল রামরাহার মতোই জলের ওপর দিয়ে ভেসে এগিয়ে এল। রামরাহা তার সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি গা থেকে খুলে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, "সেন্টারে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

যন্ত্র না থাকায় রামরাহাকে জলে নামতে হল। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। থাকলেও লাভ ছিল না। দানবদের ট্রেসারে তা ধরা পড়ত, এবং ওরা তা কেড়ে নিত।

রামরাহা খুব বোকা মানুষের মতো এগিয়ে গেল।

একজন দানব তাকে দেখে ক্রুদ্ধ এক শব্দ করল। বাকিরা বিদ্যুৎ-গতিতে ধেয়ে এল তার দিকে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রামরাহার পক্ষে এই আক্রমণ ঠেকানো মোটেই শক্ত কাজ ছিল না। কিন্তু এখন সে একটুও

গায়ের জোর দেখাবে না, তবে সামান্য একটু বাধা দেবে। নইলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।

প্রথম যে দানবটা তার দিকে তেড়ে এল, তাকে এড়াতে রামরাহা একটু দৌড়ে পালানোর ভান করল। লোকটা লম্বা হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল তার কাঁধ। আর একজন তার দু' পা ধরে সটান শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর একটা আছাড়।

রামরাহা হাসছিল। দশতলা বাড়ি থেকে সে তো কতদিন স্রেফ লাফ দিয়ে নেমেছে। তবু সে একটু যন্ত্রণার শব্দ করল। তিন-চারজন দানব এসে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল তাকে। এরা একটা অদ্ভুত ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

রামরাহা চুপ করে কথাগুলো শুনতে লাগল। তার সঙ্গে অনুবাদযন্ত্র নেই। কিন্তু বিপুল বিশ্বের অনেক গ্রহে সে ঘুরেছে, ভাষাও শুনেছে হাজার রকম। শব্দ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিপুল। তাই সে শব্দ ধরে-ধরে অর্থে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে লাগল মনে-মনে। তার মাথা টেপ রেকর্ডারের মতোই নির্ভুল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। যা শোনে বা দ্যাখে, সব হুবহু মনে থাকে।

খানিকক্ষণ শুনে রামরাহা বুঝতে পারল, এরা পৃথিবী থেকে কিছু মানুষকে জ্যান্ত অবস্থায় নিজেদের গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে নমুনা হিসেবে। এইসব মানুষের হৃৎপিণ্ড, রক্ত, ফুসফুস সব তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করবে। দেখবে এদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি। এর জন্য কয়েকজন মানুষকে মেরে ফেলতে হবে। বাকিদের জিইয়ে রেখে দেওয়া হবে চিড়িয়াখানার জন্তু হিসেবে।

চ্যাংদোলা করে এনে যে-ঘরটায় দানবেরা তাকে ফেলে দিল, সেটাতে রামরাহা বেশ কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল। যাকে দেখে সে সবচেয়ে খুশি হল, সে আংটি।

আংটি তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "রামরাহা!"

রামরাহা হাত বাড়িয়ে বলল, "যন্ত্রটা দাও।"

"যন্ত্র!" বলেই কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল আংটি। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "নেই। কেড়ে নিয়ে গেছে।"

"কী করে কাড়ল?"

"আমি যন্ত্রটায় একটা রঙিন বোতাম দেখে চাপ দিয়েছিলাম। খুব জোরে। তাতে কিছু হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একটা দানব এসে হাজির। আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে গেল এই একটু আগে।"

রামরাহা ঠোঁট কামড়াল।

"কী হবে রামরাহা?"

"দেখা যাক। কাজটা আর সহজ রইল না, এই যা।"

হঠাৎ একজন লোক এগিয়ে এসে রামরাহার মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বলল, "আচ্ছা মশাই, জাহাজের সঙ্গে মেলানো যায়, এমন একটা শব্দ বলতে পারেন?"

রামরাহা অবাক হয়ে বলল, "জাহাজ!"

আংটি বলল, "ইনি আমার বাবা। আমার বাবা একজন কবি।"

"কবি! কবি কাকে বলে?"

"যারা কবিতা লেখে।"

রামরাহা মাথা চুলকে বলল, "কবিতা! কিন্তু আমাদের দেশে তো এরকম কোনও জিনিস নেই। কবিতা! কবিতা! কীরকম জিনিস বলো তো!"

হরিবাবু খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "তা হলে আপনার দেশেরই দুর্ভাগ্য রাহাবাবু। বাঙালি হয়ে কবিতা কাকে বলে জিজ্ঞেস করছেন! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

যে-সময়ে এই নাটক ভিতরে চলছিল, ঠিক সেই সময়ে গজ-পালোয়ান তার অতিকায় চেহারাটা নিয়ে শ্বাপদের মতো এসে পৌঁছল মহাকাশযানের কাছে। একজন দানব মাত্র পাহারায়। বাকিরা রামরাহাকে ভিতরে নিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

গজ-পালোয়ান একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে দানবটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

দানবটা চকিত পায়ে একটু সরে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে নিজের বিপদ টের পেয়ে। তবে গজকে সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি সে। গজ'র কাঁধের ধাক্কায় সে ছিটকে গেল খানিকটা। তারপর উঠে এসে গজকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল।

কিন্তু পারবে কেন! গজ'র শক্তি এবং মত্ততা দুই-ই দশ-বিশ গুণ বেড়েছে। উপরন্তু সে তার প্যাঁচ-পয়জারও ভোলেনি। সে দু'হাতে বিপুল দু'খানা ঘুষি চালাল দানবটার মুখে। দানবটা টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। গজ তার পা দু'খানা ধরে পেল্লায় দুটো পাক মারল মাথার ওপর তুলে। তারপর একটি আছাড়।

কিন্তু আছাড় মারতে গিয়েই দানবটার কোঁচড় থেকে কী একটা ভারী আর শক্ত জিনিস ঠক্ করে গজ'র মাথায় পড়ল।

"উঃ," বলে বসে পড়ল গজ।

দানবটা উপুড় হয়ে পড়ে রইল। নড়ল না।

ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ এসে গজকে ধরল।

"তোমার কী হল গজদা! দানোটাকে তো আউট করে দিয়েছ।"

পঞ্চানন্দ হাতের টর্চটা জ্বেলে গজ'র মাথাটা দেখে বলল, "এঃ, খুব লেগেছে এখানটায়। কালশিটে দেখা যাচ্ছে! ...আরে, ওটা কী?" এই বলে পঞ্চানন্দ মাটি থেকে একটা গোলাকার বস্তু তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

ঘড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি।"

পঞ্চানন্দ হঠাৎ "বাপ্ রে" বলে আঁতকে উঠে চেঁচাল, "দৌড়ও! আসছে!"

কিন্তু সামান্য বে-খেয়ালে যে-ভুল তারা করে ফেলেছিল, তা আর শোধরানো গেল না। চার-পাঁচজন দানো চোখের পলকে ঘিরে ফেলল তাদের।

শেষ চেষ্টা হিসেবে হাতের ভারী বলের মতো বস্তুটা পঞ্চানন্দ প্রাণপণে ছুঁড়ে মারল একজন দানোর মাথা লক্ষ করে। কিন্তু দানোটা স্লিপের দক্ষ ফিল্ডারের মতো সেটা লুফে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা একে-একে নিক্ষিপ্ত হল দানোদের মহাকাশযানের গুপ্ত ঘরে। আংটি চেঁচিয়ে উঠল, "দাদা!"

বড় ছেলে ঘড়িকে দেখে হরিবাবু খুশি হলেন। তবে পঞ্চানন্দকে দেখে তাঁর প্রাণে যেন জল এল। হরিবাবু ভারী খুশি হয়ে বললেন, "পঞ্চানন্দ যে!"

"আজ্ঞে, আমিই। যেই শুনলুম আপনাকে এই গাধাগুলো ধরে এনেছে, অমনি আর থাকতে পারলুম না, ছুটে এলুম। তা

ভাল তো কর্তাবাবু ?"

"ভাল আর কী করে থাকব বলো। জাহাজের সঙ্গে মিল দিয়ে একটা শব্দও যে মাথায় আসছে না। নাগাড়ে ঘণ্টা-দুই ধরে ভাবছি।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "জাহাজ যখন পেয়েছেন, তখন মিলটা আর এমন কী শক্ত জিনিস। হয়ে যাবে'খন।"

"আচ্ছা, মমতাজ শব্দটা কি চলবে হে পঞ্চানন্দ ?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "চলবে, খুব চলবে।"

"কিন্তু একটা অক্ষর যে বেশি হয়ে যাচ্ছে হে।"

"তা হোক। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"না হে না, কবিতায় অধিকন্তু চলে না, ন্যূনও চলে না। দেখি আর-একটু ভেবে। সময়টাও কাটাতে হবে।"

এসব কথা যখন চলছে, তখন হঠাৎই একটা শিহরন টের পেল সবাই। তারপর তীব্র একটা বাতাস কাটার শব্দ। একটা ভারহীনতার অনুভূতি।

সবাই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাক্যহারা হয়ে গেল।

রামরাহা আংটির কানে-কানে বলল, "আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলেছি।"

আতঙ্কিত আংটি বলল, "কোথায় ?"

"মহাকাশে।"

আংটি বোবা হয়ে গেল।

যে গর্ত দিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে ফেলা হয়েছে, সেটার দিকে চোখ রেখেছিল রামরাহা। গর্তটার কোনও পাল্লা বা ঢাকনা নেই। একজন দানব ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের নজরে রাখছে। তার হাতে একটা খুদে যন্ত্র, অনেকটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মতো। যন্ত্রটা চেনে রামরাহা। ছুঁচের মুখ দিয়ে তরলের পরিবর্তে একটা আলোর রেখা বেরিয়ে আসে। যাকে লক্ষ করে ছোঁড়া হয়, সে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে।

রামরাহা আংটিকে বলল, "শোনো আংটি, এখান থেকে গর্তটার মুখ দশ ফুটের বেশি উঁচু হবে না। আমার পক্ষে এই দশ ফুট লাফিয়ে ওঠা খুব শক্ত কাজ নয়। এমনকী, ওই দানবটাকে কব্জা করাও কঠিন হবে না। কিন্তু তারপরেই গণ্ডগোল দেখা দেবে। আমরা সবাই মিলে লড়াই করে ওদের হারিয়ে দিলেও পৃথিবী বাঁচবে না। কারণ ওরা একা নয়। পৃথিবীর আরও কয়েক জায়গা থেকে ঠিক এই সময়ে একই রকম মহাকাশযানে আরও কতগুলো দানব মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওরা দূর-নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীকে ভারসাম্যহীন করে দেবে। তারপর চার্জগুলো চালু করবে। যা করবার করতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

"কী করব রামরাহা ?"

"আমার ওই গোলকটা চাই। ওটা হাতে পেলে সবই সম্ভব। নইলে..."

"নইলে কী হবে সে তো জানি।"

"তা হলে তৈরি হও। আমি যখন লাফ মারব, তখন তুমি আমার কোমর ধরে ঝুলে থাকবে। খুব শক্ত করে ধরবে। পড়ে যেও না। আমি উপরে উঠেই দানবটার সঙ্গে লড়াই করব। সেই ফাঁকে তুমি সরে পড়বে। যেমন করেই হোক, গোলকটা তোমাকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের বাঁচার এবং পৃথিবীকে বাঁচানোর ওইটেই একমাত্র এবং শেষ অবলম্বন। পারবে ?"

আংটি দাঁতে ঠোঁট টিপে বলল, "এমনিতেও তো মরতেই হবে। পারব।"

"তবে এসো। গেট রেডি।"

দশ ফুট হাইজাম্প দেওয়া যে সম্ভব, এটা বিশ্বাস করাই শক্ত। বিশেষ করে একটুও না দৌড়ে শুধু দাঁড়ানো অবস্থা থেকে অতটা উঁচুতে লাফানো এক অলৌকিক ব্যাপার। আংটির বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু রামরাহার কোমর ধরে দাঁড়াল। মহাকাশযানটা কাঁপছে, আর কেমন যেন একটা শিহরন খেলে যাচ্ছে বাতাসে। কানে একটা অদ্ভুত শব্দ বা তরঙ্গ এসে লাগছে। মহাকাশের অভিজ্ঞতা তো নেই আংটির। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। তবু সে প্রাণপণে ধরে রইল রামরাহাকে।

রামরাহা ওপরের দিকে চেয়ে একটু হিসেব কষে নিল। মহাকাশে যদিও ভারহীন অবস্থায় তারা পৌঁছে গেছে, তবু এই মহাকাশযানে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। কৃত্রিম উপায়ে এরা এই ঘরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মতোই অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। সেইটে হিসেব কষে নিয়ে রামরাহা আচমকা শূন্যে একটা রকেটের মতো মসৃণ লাফ দিল। আংটির মনে হল, সে যেন লিফটে করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

চমৎকার লাফ। গর্তটার ভিতর দিয়ে সোজা উঠে দু'পাশে ছড়ানো পায়ে দাঁড়িয়েই দানবটাকে রামরাহা দুই হাতে ধরেই শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর চাপা গলায় বলল, "আংটি, পালাও। কাজ সেরে আসা চাই।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত বইমেলায় প্রকাশিত তোমাদের কয়েকটি বই

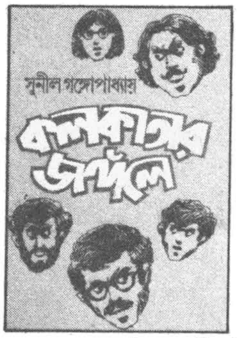

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সন্তু-কাকাবাবুর নতুন অ্যাডভেঞ্চার

কলকাতার জঙ্গলে

দাম ১০·০০

সন্তুর চেনা এক ছেলের কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করে কাকাবাবুর কাছে হঠাৎ এসে হাজির হল এক মেয়ে। দেবলীনা। দেবলীনা দত্ত। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। দু-মাসের ছুটি। তার খুব ইচ্ছে, কাকাবাবুর সঙ্গে সেও যাবে কোনও অ্যাডভেঞ্চারে।

কিন্তু যাই বললেই তো যাওয়া যায় না। কাকাবাবুর কাছে আশ্বাস না পেয়ে রেগেমেগেই চলে গেল দেবলীনা। চলে গেল। কিন্তু বাড়ি ফিরল না। পাঁচ-ছ দিন বাদে টি ভি-র পর্দায় তার ছবি ফুটে উঠল। দেবলীনা নিরুদ্দেশ। সেই শুরু। সন্তুদের বাড়িতে ফেলে-যাওয়া জুতো জোড়া হাতে করে কাকাবাবু আর সন্তু বেরুলেন নিরুদ্দিষ্টা দেবলীনার খোঁজে—সেখান থেকেই শুরু আশ্চর্য কৌতূহল-জাগানো এক রহস্য কাহিনীর।

কোথায় গেল দেবলীনা? ইচ্ছা করে পলাতক? নাকি সত্যি কোনও খপ্পরে পড়েছে সে?

নানান গা-শিরশিরে ঘটনার মধ্য দিয়ে কীভাবে এর উত্তর মিলল, তারই দুরন্ত বর্ণনা এই রহস্য অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীতে।

প্রচ্ছদ : দেবাশিস দেব

সাধনা মুখোপাধ্যায়ের

প্রেরণা-জাগানো কিশোরগ্রন্থ

দুঃসাহসিক অভিযান

দাম ১৫·০০

শুরু সেই আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের অভিযানের আগে, আদ্যিকালের অভিযান থেকে; আর শেষ এই সেদিনের এভারেস্ট অভিযানের কাহিনী দিয়ে। মধ্যে রয়েছে এই পৃথিবীর বুকের যাবতীয় স্মরণীয় অভিযানের গল্পপ্রতিম বিবরণ। বাংলা ভাষাতেই নতুন স্বাদের বই, 'দুঃসাহসিক অভিযান'।

আজও অব্যাহত মানুষের অভিযানের নেশা। কিন্তু এ-যুগের অভিযান সবই প্রায় সম্মিলিত উদ্যোগে, সরকারী-বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। একটা সময় ছিল, যখন মানুষ একা-একা নিজের সীমানা ছেড়ে বেরুতে শুরু করেছিল। সেই দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভিযান গোটা মানবসভ্যতাকেই করেছে উপকৃত। সেইসব অভিযানের বর্ণনা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সেইসব গল্পই এ-বইতে একসঙ্গে উপহার দিয়েছেন কবি-প্রাবন্ধিক সাধনা মুখোপাধ্যায়। তথ্যসংগ্রহে কার্পণ্য করেননি তিনি, লিখেছেন ও সুন্দর, ঝরঝরে ভাষায়। 'জানা অজানা' সিরিজের বা রান্নার বইগুলির মতো এ-বইও একাধারে স্বাদু এবং শিক্ষাপ্রদ। ছোটদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য ও প্রেরণা-জাগানো বই-রূপে গণ্য হবে 'দুঃসাহসিক অভিযান'। সুখপাঠ্য একটি ভূমিকা লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

খেলাচ্ছলে বিজ্ঞান

মজার ইলেকট্রনিকস

দাম ৮·০০

একই সঙ্গে শিক্ষামূলক এবং মজাদার বই লেখায় যাঁর জুড়ি পাওয়া ভার, সেই পার্থসারথি চক্রবর্তী এবার এগিয়ে এসেছেন আধুনিকতম তাজ্জব কাণ্ডকারখানার কৌশল শেখাতে। ইলেকট্রনিকসের যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে কাজচলতি ধারণা তৈরি হবে এ-বই থেকে, সেইসঙ্গে শুধুমাত্র ব্যাটারির কারেন্ট দিয়ে কম খরচে কীভাবে তৈরি করা যায় নানান মজার-মজার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, তাও শেখা যাবে। এ-বইতে ভর্তি ছবি আর পুরো ষাট পৃষ্ঠার ডায়াগ্রাম। সেসব দেখে আর নিয়ম শিখে, দুর্দান্ত সব প্রোজেক্ট তৈরি করতে বসে যাবে ছোট্টরা।

কী-কী তৈরি করা যাবে? বহু কিছু। যেমন, চোর ধরবার যন্ত্র, সত্যিকারের ছোট্ট রেডিও, পট প্ল্যান্ট টেস্টার, অ্যামপ্লিফায়ার। কিছু কিছু খেলাও আছে। লাল আলো নীল হল, হাত না-কাঁপার খেলা—এইসব। এ-বই হাতে পাওয়া যা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্যটাকেও হাতের মুঠোয় পাওয়াও তাই।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

হলদে মুখ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মিঃ গ্রান্ট মনরো ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর স্ত্রী এফি শান্ত স্বভাবের মহিলা, কিন্তু ইদানীং তাঁর আচরণ কিছুটা পালটে গেছে। এফির আগের পক্ষের স্বামী ও ছেলের মৃত্যু হয়েছিল পীতজ্বরে। দ্বিতীয় স্বামীকে এফি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন। পরে তিনি যখন মিঃ মনরোর কাছে এক শো পাউন্ড চান, তখন টাকাটা কেন দরকার হচ্ছে, তা জানাতে রাজি হন না। শুধু বলেন, 'টাকাটা আমার চাই।' তারপর···

মিঃ গ্রান্ট একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার শুরু করলেন তাঁর কাহিনী, "আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে, আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা বাড়ি আছে। আমাদের বাড়ি আর সেই বাড়িটার মাঝখানে একটা মাঠ। তবে ওই বাড়িটায় যেতে গেলে রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা ছোট গলি দিয়ে বেঁকে যেতে হয়। তার পরেই খানিকটা বাগানের মতো আছে। সেখানে পায়চারি করতে আমার খুব ভাল লাগে। গত আট মাস ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। যাতায়াতের পথে আমি মাঝে-মাঝে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজের মনেই ভাবি, আহা, কী সুন্দর বাড়িটা!"

হোমস বলল, "তারপর?"

"গত সোমবার সন্ধেবেলা আমি ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আসছিলুম। দেখলুম, একটা খালি ভ্যান-গাড়ি ওই বাড়িটার দিক থেকে আসছে। ভাল করে নজর করতে দেখতে পেলুম, বাড়িটার দরজার কাছে কার্পেট আর নানান জিনিস নামানো রয়েছে। বুঝলুম, বাড়িটায় এবার লোক আসছে। আমি বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। মনে-মনে ভাবছিলুম, যারা আসছে তারা কেমন ধরনের লোক কে জানে! দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল দোতলার জানালা থেকে কেউ যেন আমাকে দেখছে।

"সেই মুখটা ঠিক কীরকম তা আমি বলতে পারব না। তবে সেই মুখের দিকে তাকাতেই আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। তাই সেই মুখটা আমি খুব ভাল করে দেখতে পাইনি। তবে যা দেখেছিলুম, তাতে আমার মনে হল এ কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মুখ নয়। এ কোনও অমানুষিক মুখ। আরও ভাল করে দেখবার জন্যে আমি একটু এগিয়ে গেলুম। কিন্তু আমি এগিয়ে যেতেই মুখটা জানালা থেকে সরে গেল। সরে গেল বললে ভুল হবে। আমার মনে হল, কে যেন ছোঁ মেরে মুখটাকে উপড়ে নিয়ে গেল। আমি প্রায় পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম যে, ব্যাপারটা কী হতে পারে। সে মুখটা কোনও ছেলের না মেয়ের তাও বুঝতে পারিনি। যেটা আমাকে আশ্চর্য করেছিল, সেটা হল, সেই মুখের রং। মুখটা বীভৎস রকমের হলদে। ব্যাপারটা এমন ভাবিয়ে তুললে যে, আমি ঠিক করলুম বাড়িতে কারা এসেছে সে-খবরটা আমাকে নিতেই হবে। আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজার বেল টিপলুম। বেল টিপতেই এক বিরাট লম্বা-চওড়া মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ দেখলেই ভয় হয়।

"খুব কড়া ভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'কী চাই?' কথা বলার ধরন দেখে বুঝলুম ভদ্রমহিলার বাড়ি ইংল্যান্ডের উত্তর দিকে।

"আমি আমার বাড়িটা দেখিয়ে বললুম, 'ওই দেখছেন আমার বাড়ি। আপনারা তো আমাদেরই পাড়াতে এলেন। দেখলুম কিছুক্ষণ আগেই এসেছেন। তাই এলুম যদি আপনাদের কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি।'

"'তাই নাকি? বেশ, দরকার হলে আপনাকে খবর দেব', বলেই সেই মহিলা আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এইরকম ভাবে অপমানিত হয়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি বাড়ি ফিরে গেলুম। যদিও এই ঘটনাটা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছিলুম, তবুও সারা সন্ধে বারবার সেই অস্বাভাবিক মুখ আর ভদ্রমহিলার দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ছিল। আমি ঠিক করলুম, এসব কথা আমার স্ত্রীকে বলব না। তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে যে, তিনি একটু ভিতু প্রকৃতির মহিলা, আর দু নম্বর কারণ হচ্ছে, সেই মহিলার দুর্ব্যবহারের কথা বলে পড়শিদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা আগে থেকেই খারাপ করে দেওয়া ঠিক নয়। যাই হোক, ঘুমোতে যাবার আগে আমি আমার স্ত্রীকে ওই বাড়িতে লোক আসবার কথা বললুম। আমার স্ত্রী অবশ্য কথাটা কানে নিলেন না।

"এমনিতে আমার ঘুম খুব গাঢ়। আমার এই ঘুমের জন্যে আত্মীয়রা আমাকে ঠাট্টা করে খুব। বলে যে, কোনও কিছুতেই নাকি আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা সন্ধেবেলার সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার জন্যে হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, সে রাতে ঘুমটা মোটেই বেশ গভীর হচ্ছিল না। আধো ঘুম আর আধো তন্দ্রার মধ্যে আমার মনে হল ঘরের মধ্যে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ঘুম-চোখে দেখলুম, আমার স্ত্রী বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমি জড়িয়ে-জড়িয়ে তাঁকে বোধহয় এত রাত্রে বাইরে যেতে বারণ করছিলুম। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর মোমবাতির আলো পড়ায় আমার তন্দ্রা তো ছুটে গেলই, মুখ দিয়েও কোনও কথা

বেরোল না। তাঁর মুখের ভাব একদম পালটে গেছে। এরকম চেহারা তো আমি কোনওদিন দেখিনি। তাঁর মুখের রং একেবারে সাদা। তিনি রীতিমত হাঁফাচ্ছেন। জামাকাপড় পরতে পরতে তিনি প্রায়ই খাটের দিকে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিলেন, আমি ঘুমোচ্ছি কি না। তারপর আমি ঘুমিয়ে আছি মনে করে পা টিপে-টিপে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই শুনতে পেলুম খট্ করে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলুম। আমি চিমটি কেটে দেখে নিলুম যে, সত্যি-সত্যি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে দেখলুম। রাত তিনটে। এত রাত্রে আমার স্ত্রী রাস্তায় বের হলেন কেন? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না।

"আমি বিছানায় বসে-বসে যতই চিন্তা করতে লাগলুম, ততই সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। এমনি করে প্রায় মিনিট-কুড়ি কেটে গেল। হঠাৎ টের পেলুম, প্রায় নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

"আমার স্ত্রী ঘরে পা দিতেই আমি বললুম, 'এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে এফি?'

"আমার কথা শুনে ভয়ানক চমকে গিয়ে এফি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। এফির কান্নায় আমি আরও হতভম্ব হয়ে গেলুম। আমার স্ত্রী এমনিতেও হাসিখুশি স্ফূর্তিবাজ। আমি আরও ঘাবড়ে গেলুম যখন দেখলুম যে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে এফি শুয়ে পড়লেন।

"একটু পরে খানিকটা জোর করে হাসতে-হাসতে আমার স্ত্রী বললেন, 'ও তুমি, জেগে আছ? আমার ধারণা ছিল যে রাত্তিরে কোনও কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না।'

"আমি বেশ গম্ভীর গলায় বললুম, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

"'তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ দেখছি। অবশ্য অবাক হবারই কথা। সত্যি এর আগে এরকম কখনও হয়নি। আমার কীরকম দম বন্ধ হয়ে আসছিল, হাঁফ ধরছিল। মনে হল বাইরের খোলা বাতাসে না ঘুরে এলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। তাই আমি বাইরের রাস্তায় দু' চার মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম। এখন ঠিক হয়ে গেছি।'

"আমি লক্ষ করলুম এতক্ষণ এফি একবারও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। আর তার গলার স্বরও কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলুম যে, এফি বাজে কথা বলছে। তাই তার কথার কোনও উত্তর দিলুম না। তবে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কেন এফি বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন এই চিন্তাতেই আমার আর বাকি রাতটুকু ঘুম হল না।

"পরের দিন আমার লন্ডনে যাবার দরকার। কিন্তু একে সারা রাত ঘুম হয়নি, আর তার ওপর মাথার মধ্যে ওই চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল বলে আমি সকালবেলায় চুপচাপ বসে ছিলুম। এফিও কোনও কথা না বলে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ঘরে বসে ভাল লাগছিল না। তাই ব্রেকফাস্ট সেরে একটু হাঁটতে বেরোলুম।

"হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্টাল প্যালেস অবধি চলে গেলুম। ঘণ্টাখানেক মাঠে-মাঠে ঘুরে যখন নরবেরিতে এলুম, তখন একটা বেজেছে। ওই বাড়িটা আমার ফেরার পথে পড়ল। বাড়িটার সামনে এসে আমি একটু দাঁড়ালুম। ভাবলুম, সেই অস্বাভাবিক মুখের দেখা আর একবার যদি পাই। হঠাৎ দেখলুম, আমার স্ত্রী ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলেন। মিঃ হোমস, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, তাঁকে এখানে দেখে আমি কী রকম আশ্চর্য হয়েছিলুম।

"আমাকে ওখানে দেখে আমার স্ত্রীও কম আশ্চর্য হননি। তিনি আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি দেখলুম তাঁর হাত-পা কাঁপছে।

"আমাকে তিনি বললেন, 'আমি এঁদের কোনও দরকার-টরকার আছে কি না জানতে এসেছিলুম। তুমি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

"'ও, তা হলে তুমি কাল রাত্রে এখানেই এসেছিলে?' আমি বললুম।

"আমার স্ত্রী বললেন, 'তুমি কী বলছ!'

"'আমি ঠিকই বলছি, তুমি এখানেই এসেছিলে। এরা কারা, যাদের সঙ্গে অত রাত্রে তুমি চুপিচুপি দেখা করতে এসেছিলে।'

"'আমি এখানে আগে কখনও আসিনি।'

"'জেনেশুনে তুমি মিথ্যে কথা বলছ কেন? তোমার বলা থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি সত্যি কথা বলছ না। কেন ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে যাচ্ছ? তুমি তো আগে এরকম ছিলে না।' আমি একটু রাগ করেই বললুম। তারপর বললুম, 'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি বাড়ির ভেতরে গিয়ে ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করব।'

"আমার স্ত্রী অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়লেন, 'না, না। ভগবানের দোহাই এমন কাজ কোরো না।' তাঁর কথা না শুনে আমি সেই বাড়ির সদর দরজার দিকে পা বাড়াতেই তিনি আমাকে হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। 'আমার কথা শোনো। ও রকম কোরো না। পরে একসময় আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু আমার কথা না শুনে যদি এখনই তুমি ও বাড়িতে যাও তা হলে ভাল তো হবেই না, ফল উলটো হবে।'

"আমি আমার স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে তাঁকে একরকম জোর করে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। আমার স্ত্রী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

"'আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি ঠকবে না। এইবারের মতো আমাকে বিশ্বাস করো, তোমার ভাল হবে। যদি তুমি আমার কথা শুনে এখান থেকে এখনই চলে এসো তো তুমি ঠকবে না। আর আমার কথা না শুনে জোর করে যদি বাড়ির মধ্যে যাও তো তুমিই পরে পস্তাবে।'

"আমার স্ত্রীর বলার ধরনে এমন একটা কিছু ছিল যে, আমি কী করব ঠিক করতে পারছিলুম না। শেষকালে বললুম, 'ঠিক আছে। একটি শর্তে আমি তোমার কথা মানতে পারি। সেটা হল এই ব্যাপারের এখানেই ইতি করতে হবে। তোমার আর এখানে আসা চলবে না। এটা করতে তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমি এ-সম্বন্ধে আর কোনও কথা জানতে চাইব না।'

"আমার স্ত্রী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি জানতুম তুমি আমার কথা শুনবে। ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই

হবে। এখন এখান থেকে চলো তো।’ আমার স্ত্রী আমার হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে চলে আসবার সময়ে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলুম, সেই অদ্ভুত ধরনের মুখটা দোতলার জানালার বন্ধ শার্সির ভেতর দিয়ে আমাদের লক্ষ করছে। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। ওই মুখটা কার? তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর যোগটাই বা কী? ওই অশিষ্ট মহিলার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কী সম্পর্ক তা আমার মাথায় ঢুকল না কোনও মতেই। অদ্ভুত একটা ধাঁধা। যে ধাঁধার সমাধান করতে পারব বা কি পারব না কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। অথচ এ সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আমার মনে শান্তি হবে না।

“এর পরের দুটো দিন বেশ ভালই গেল। আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই বাড়িতে বসে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিলুম। কিন্তু তৃতীয় দিনে টের পেলুম যে, আমার স্ত্রী কথার খেলাপ করেছেন।

“সেদিন আমাকে ব্যবসার খাতিরে লন্ডন যেতে হয়েছিল। আমি সাধারণত লন্ডন থেকে ৩টে ৩৬-এর ট্রেনে বাড়ি ফিরি। সেদিন কাজ সকাল-সকাল শেষ হয়েছিল বলে ২টো ৪০-এর গাড়িতে ফিরে এলুম। আমি দরজার বেল টিপতে আমাদের কাজের মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিলে। লক্ষ করলুম যে, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় সে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

“‘তোমার বউদিদি কোথায় গেছেন?’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম।

“‘বউদিদি একটু বেড়াতে বেরুলেন।’

“আমার তখনই খটকা লাগল। নিশ্চিত হবার জন্যে আমি আর কথা না বাড়িয়ে দোতলায় চলে গেলুম। দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াতেই দেখলুম যে, কাজের মেয়েটি মাঠের মধ্যে দিয়ে ওই বাড়িটার দিকে ছুটছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। আমার স্ত্রী ওই বাড়িতে গেছেন। আর কাজের মেয়েটিকে বলে গেছেন যে, আমি ফিরে এলে সে যেন তাঁকে খবর দিয়ে আসে। রাগে আমার রক্ত টগবগ করতে লাগল। আমি দৌড়ে নীচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। আমি ঠিক করে ফেললুম যে, এ-ব্যাপারের হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলব। যেতে যেতে দেখলুম আমার স্ত্রী ও কাজের মেয়েটি মাঠ দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। আমি ওদের দিকে লক্ষ না করে সোজা চলে গেলুম। ওই বাড়িতে কী আছে তা আমাকে জানতেই হবে। আমি দরজায় টোকা না দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গেলুম।

“বাড়ির ভেতরে সব চুপচাপ। একতলায় কারও সাড়াশব্দ পেলুম না। শুধু রান্নাঘরে চায়ের কেতলিতে জল ফুটছিল। আর একটা কালো বেড়াল কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে ছিল। সেই অভব্য মহিলাকেও দেখতে পেলুম না। তখন অন্য ঘরগুলো দেখলুম। কেউ কোথাও নেই। দোতলায় উঠে গেলুম। সেখানেও ভোঁ-ভাঁ। বাড়িটায় তো কেউ নেই। ঘরগুলো কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। শুধু দোতলার যে ঘরটার জানালায় সেই অদ্ভুত মুখের দেখা পেয়েছিলুম, সেই ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের আসবাবপত্রও বেশ ভাল। ঘরে ঢুকতেই যা দেখলুম তাতে আমি আরও অবাক হয়ে গেলুম। ঘরের ম্যান্টেল পিসের ওপরে আমার স্ত্রীর একটা ছবি। ছবিটা আমারই কথায় মাসতিনেক আগে তুলেছিলেন। আমি যখন নিশ্চিত হলুম যে, বাড়িটাতে কেউ নেই তখন আমি সেখান থেকে চলে এলুম। কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান তো হলই না, উলটে সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

“আমি বাড়ি ফিরে এলুম। আমি বাড়িতে পা দিতেই আমার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

“‘আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। এবারের মতো তুমি আমাকে মাফ করো।’

“‘তা হলে আমাকে সব কথা খুলে বলো।’

“আমার স্ত্রী কেঁদে বললেন, ‘তা হয় না।’

“‘যতক্ষণ না তুমি আমাকে বলছ ওই বাড়িতে কারা থাকে, আর কেনই বা ওদের তুমি তোমার ছবি দিয়েছ, ততক্ষণ তোমার কোনও কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

“তারপর আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি। এটা কালকের কথা। সেই থেকে আমি ব্যাপারটা নিয়ে কেবলই ভেবেছি। হঠাৎ আজ সকালে আমার মনে হল, আপনি হয়তো একটা হদিস দিতে পারেন। আমি কোনও কিছু গোপন না করে সব কথা আপনাকে বলেছি। আপনার আর যদি কিছু জানবার থাকে তো আমাকে বলুন, আর এ-রহস্যের একটা মীমাংসা করে দিন।”

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধাঁধা

মাইনে পেয়েই ছোট্‌কা যে একবার বইয়ের দোকান ঘুরে আসে, এ আমি ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছি। তাই, মাইনের পরের রবিবার ছোট্‌কা যখন বসে-বসে নতুন কেনা বইটার পাতা উলটোচ্ছে, তখনই আমি আঁচ করেছি, বইটা নির্ঘাত আগের দিন সন্ধেবেলা কিনে এনেছে ছোট্‌কা। শুধু হাতের বইটাই যে নতুন তা নয়, পাশের টেবিলে পড়ে থাকা পকেট-অভিধানটাও এর আগে চোখে পড়েনি। আমি সেটাই হাতে তুলে নিলাম।

ছোট্‌কা তখনও হাতের বইটায় মগ্ন। আমি যে ঘরে ঢুকেছি, নিশ্চিত দেখেছে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরও যখন কিছু বলছে না, আমি একটু সমস্যাতেই পড়লাম। কেননা, পকেট-অভিধানটার মলাট নতুন হলেও, বইটা পুরনো। এই অভিধানই একবার আমাকে কিনে দিয়েছিল ছোট্‌কা। এবারও নিশ্চিত কাউকে উপহার দেবে বলে কিনেছে। তা কিনুক, কিন্তু অভিধানটা নিয়ে আমিই বা কতক্ষণ পাতা উলটোতে পারি!

ছোট্‌কা বোধহয় এতক্ষণে সেটা টের পেয়েছে। হাতের বইটার মধ্যে একটা পেজ-মার্ক ঢুকিয়ে রেখে আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বইটা টেবিলে রাখতে-রাখতে বলল, "আমি ভাবলাম সতুবাবু বোধহয় অভিধান দেখে একের-পর-এক নতুন শব্দ মুখস্থ করছে। কিন্তু কোথায় কী! শুধু পাতা উলটোলেই কি অভিধান ঘাঁটা হয়?"

"আমার তো এটা আছে," আমি নিজের সাফাই গাইবার জন্য বললাম, "কতক্ষণ আর চেনা বই নিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে?"

হো-হো করে হেসে উঠল ছোট্‌কা আমার এই উত্তর শুনে। তারপর বলল, "অভিধান আবার পুরনো হয় নাকি? হাসালে সতুবাবু, হাসালে। বেশ, তা হলে নতুন এই ধাঁধাটারই উত্তর দাও।"

প্রথম ধাঁধা ॥ আমার কাছে মোট যত টাকা ছিল তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে কিনেছি একটা প্রবন্ধের বই। এরপর যত অবশিষ্ট ছিল, তার তিন ভাগের দু' ভাগ দিয়ে কিনেছি একটা পকেট-অভিধান। তারপরে দেখলাম, পকেটে পড়ে আছে মাত্র বারো টাকা। কত টাকা ছিল আমার কাছে, বইয়ের দোকানে ঢোকার আগে? বইগুলোরই বা দাম কত?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ হৃদয়হীন একটি ছেলের নাম ছিল 'রিদয়'। কোন্ বইতে পেয়েছ তার দেখা? কার লেখা সে-বই?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

হিমমহাম

গতবারের উত্তর ॥ (১) (ক) Bashful (খ) Flash (গ) Cashew (ঘ) Wash (ঙ) Smash। (২) "A little learning is a dangerous thing." (৩) রোরুদ্যমান।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
	■	■		■	■	
■	৭				৮	■
■		■		■		■
৯		■		■	১০	১১
১২			■	১৩		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যজ্ঞকাঠ। (৩) সপ্তসুরের একটি। (৫) রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র। (৭) বাঘা যতীনের স্মৃতি বহন করছে কোন্ নদী? (৯) রাজস্থানের পাহাড়। (১০) চার যুগের একটি। (১২) তালু থেকে উচ্চারিত। (১৩) বিভীষণ-পত্নী।

উপর-নীচ : (১) সহপাঠী। (২) পৃথিবী। (৩) ধার। (৪) নক্ষত্রবিশেষ। (৬) অর্জুনপুত্র। (৭) গায়ক পাখিবিশেষ। (৮) ভ্রমর। (৯) ফলবিশেষ। (১১) লাতিন আমেরিকার একটি দেশের রাজধানী।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বা	তা	সা	■	র	ন	পা
■	রা	জ	প্রা	সা	দ	■
■	■	■	যো	■	■	■
■	স	মা	প	ত	ন	■
জ	ঙ্ঘা	■	বে	■	জ	বা
খ	রা	■	শ	■	রা	হা
ম	ম	■	ন	■	না	না

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য দরকার বারোটি পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা বারোটি টুথপিক। কাঠিগুলোকে টেবিলের উপর পর পর সাজিয়ে রাখবে। নীচের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সাজাও—

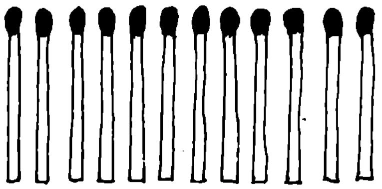

ব্যস্, তুমি খেলার জন্য রেডি।

এবার ডাকো বন্ধুদের। তাদের এই কাঠিগুলো দেখাও প্রথমে। গুনে-গুনে বারোটা কাঠি দেখাবে।

এবার তাদের বলো, এই বারোটা কাঠি থেকে একটা কাঠি এমনভাবে সরাতে হবে যাতে কিনা টেবিলে নয় ছাড়া কিছু দেখা যাবে না। তবে হ্যাঁ, বাকি কাঠিগুলোকে, টেবিলের উপরেই, যেমনভাবে খুশি সাজানো যাবে।

খুব মন দিয়ে দেখে নাও, ঠিক কী করতে বলবে বন্ধুদের। কেননা, বলাটা যদি ভুল হয়, খেলার মজাটাই যাবে মাঠে মারা। মনে রাখবে, একটা কাঠি সরিয়ে অন্য কাঠিগুলোকে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে রাখার কথা বলা হচ্ছে, আর শেষ উত্তর হবে, নয়।

কী, গুলিয়ে গেল?

বেশ, তা হলে এগারোটা কাঠি দিয়ে কীভাবে নয় করা যায় সেটা দেখে নাও, তারপর যেভাবে খুশি সেভাবে বন্ধুদের নিয়ে মজা করো।

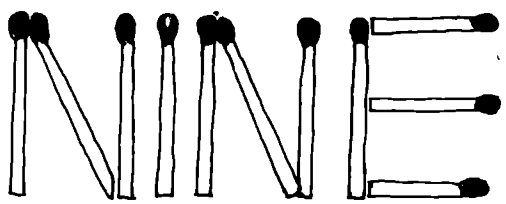

মজারু

হাসিখুশি

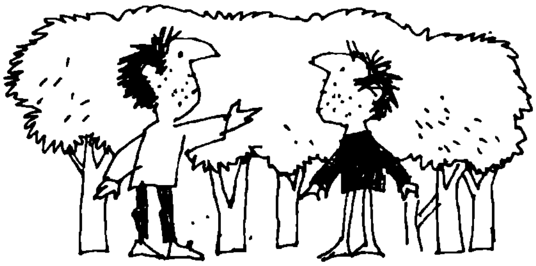

জঙ্গলে পথ-হারিয়ে-ফেলা একজন হঠাৎ আরেকজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলের বাইরে যাবার পথটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন? তিনদিন ধরে খুঁজছি।"

হতাশ গলায় জবাব দিল দ্বিতীয়জন, "কী করে বলব বলুন? আমিই তো পাঁচদিন ধরে খুঁজছি।"

"টুকলু, 'অপারগ' শব্দ দিয়ে একটা বাক্য রচনা করো তো।"

"আমি অপারগ, স্যার।"

"বেশ তো শক্তসমর্থ চেহারা, ভিক্ষে করছ কেন? খেটে খেতে পারো না?"

"আপনার মতো লোকের কাছ থেকে কিছু আদায় করাটাই তো একটা বিরাট খাটনির ব্যাপার।"

"ওয়েটার, প্লেটটা পালটে দাও। ভীষণ নোংরা।"

"অমন কথা বলবেন না স্যার। আমাদের রেস্টুরেন্টের খাবারদাবার নোংরা, কিন্তু বাসনপত্র একেবারে ঝকঝকে-তকতকে।"

"কাল অতিথিদের সঙ্গে তুমি খেতে বসবে না কালু।"

"কেন বাবা, আমি কি অতিথিদের সঙ্গে খেতে বসলে অভদ্রতা করি?"

"তা নয়। তোমার খাওয়া দেখে ওঁরা অনুপ্রাণিত হলেই বিপদ।"

"এটা কোন্ জাতের কুকুর ভাই?"

"পুলিশ-কুকুর স্যার।"

"বোঝা যাচ্ছে না তো!"

"বোঝা যাবে কী করে? সাদা পোশাকে আছে যে।"

"আপনার বাচ্চা কুকুরটা আমার গোড়ালিতে কামড়েছে।"

"আফসোস হচ্ছে বুঝি, ঘাড়ে কামড়ায়নি বলে?"

ছবি : দেবাশিস দেব

রোদের চমক!
আর দাম...
দাম মাত্র এইটুকু
Double Power
SUNLIGHT
DETERGENT
POWDER
For a brighter wash
সানলাইট ডিটারজেণ্ট পাউডার আপনার কাপড়ে এনে
দেয় এমন রোদের চমক যা, সাধারণ পাউডার দিয়ে
কোনোমতেই হওয়া সম্ভব নয় – আর দাম, একেবারেই কম !
সানলাইট
ডিটারজেন্ট পাউডার
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
OBM/6801/BEN

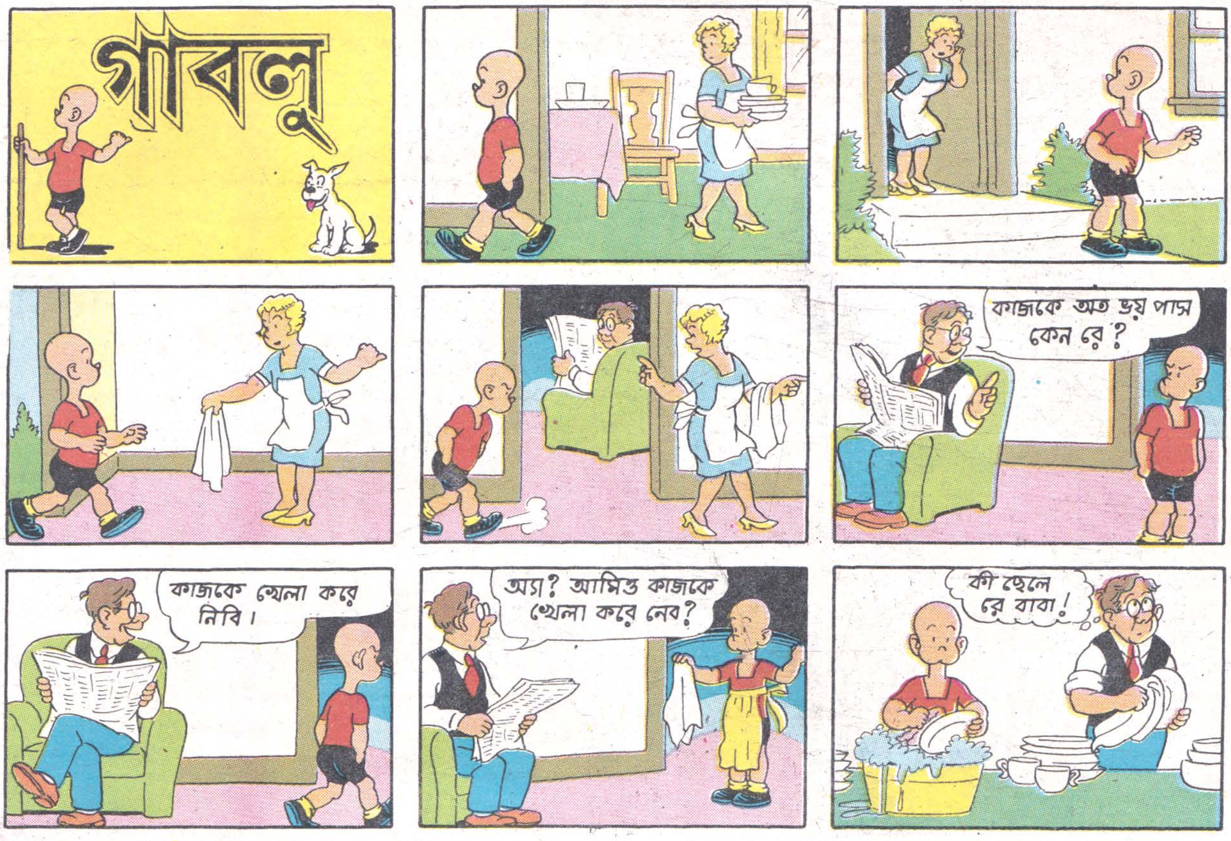
গাবলু
কাজকে অত ভয় পাস কেন রে?
কাজকে খেলা করে নিবি।
অ্যা? আমিও কাজকে খেলা করে নেব?
কী ছেলে রে বাবা!

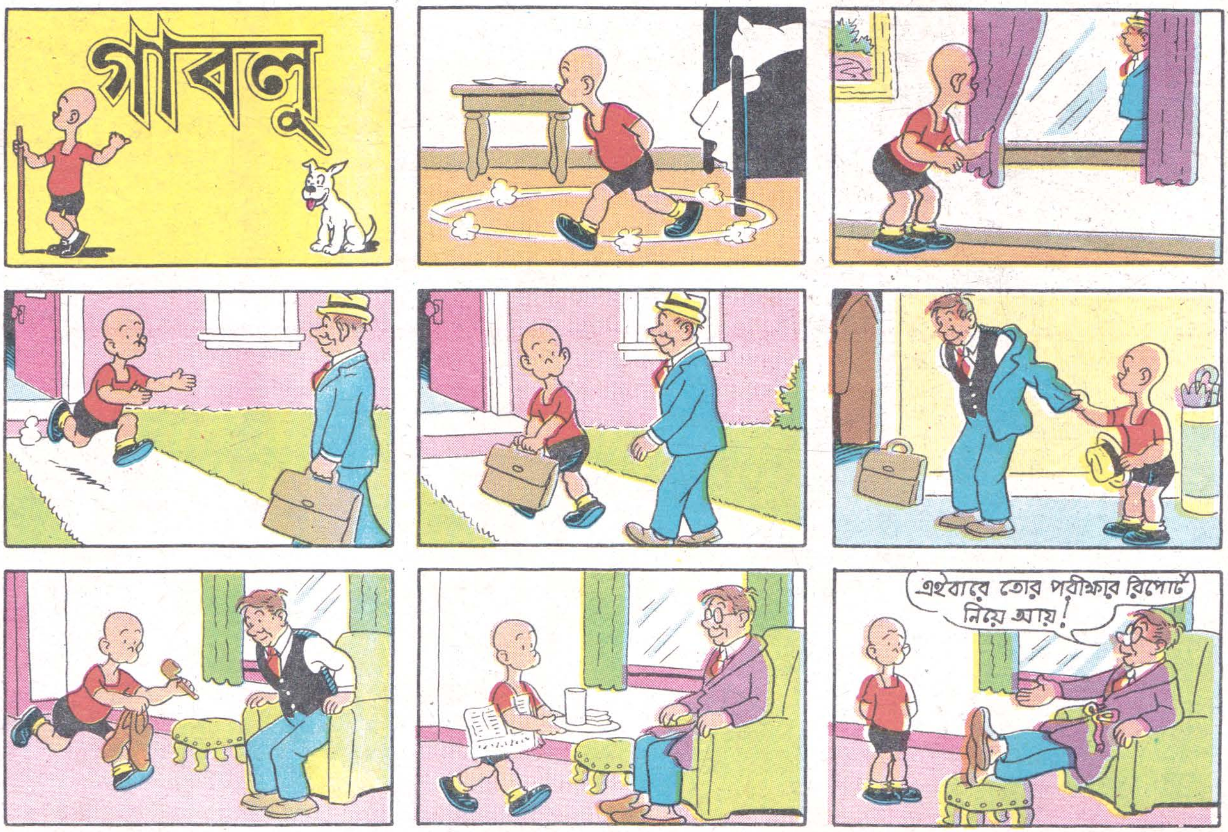
গাবলু
এইবারে তোর পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে আয়!

হকি সিরিজ ভারত জিতল

সুজয় সোম

উনিশশো ছিয়াশির সাত-টেস্টের সিরিজে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়রা হারিয়ে দিলেন পাকিস্তানিদের ৩-২ টেস্টে।

জানোই তো, নিজেদের মাঠে ২-১ টেস্টে এগিয়ে গিয়েছিল মহম্মদ শাহিদের দলবল। চব্বিশে ফেব্রুয়ারি শিয়ালকোটের জিন্না স্টেডিয়ামে চতুর্থ টেস্ট জিতে গেল পাকিস্তান। সিরিজে সমতা এল। খেলার শুরু থেকেই ভারতীয় ডিফেন্সকে আতান্তরে ফেললেন পাক-ফরোয়ার্ডরা। তেরো মিনিটে প্রথম গোল করলেন নাসির আলি। পেনাল্টি কর্নারের ফিরতি বলে তুমুল হিট! বিরতির ঠিক পরেই আরও দুটো গোল বেমালুম চেপে বসল ভারতের কাঁধে। লেফট ইন ফরহাত খাঁ ও রাইট আউট মাকসুন হোসেনের ফিল্ড গোল।

৩-০ গোলে পিছিয়ে ক্যাপ্টেনসায়েবের নেতৃত্বে ভারতের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা তেড়েফুঁড়ে গেলেন। ছ'টা পেনাল্টি কর্নার থেকে দুটো গোল পাওয়া গেল। দুটো গোলই করলেন লেফট ব্যাক মহিন্দর পাল সিং।

ছাব্বিশ তারিখে সারগোধার পঞ্চম টেস্ট শেষ হল ২-২ গোলে। খেলার প্রথম পর্বে দুর্দান্ত স্টিকওয়ার্ক, তড়িঘড়ি জায়গা বদলে গোটা মাঠ দখল করে নিলেন পাকিস্তানিরা। দ্বিতীয়ার্ধের সাত মিনিটে দলের প্রথম গোল করলেন ফরহাত, দলপতি হাসান সর্দারের ক্রস পাশ থেকে বল পেয়ে। তেষট্টি মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি দিলেন ক্যাপ্টেনসায়েব নিজেই। তবে ওয়াসিম ফিরোজের ভূমিকাও ছিল অনেকখানি। বল তৈরি করে দিয়েছিলেন চমৎকার।

ভারতের দুটো গোলই হয় মহিন্দরের পেনাল্টি কর্নার থেকে। দুবারই একক চেষ্টায় বিপজ্জনক অ্যাটাক তৈরি করেছিলেন শাহিদ। পেনাল্টি কর্নার করা ছাড়া বিপদ সামলাবার আর কোনও উপায় ছিল না পাক-ডিফেন্ডারদের।

ক্যাপ্টেন শাহিদ ও ক্যাপ্টেন হাসান সর্দার

তবু শেষরক্ষা হল না।

২-১ গোলে পিছিয়ে থেকে উঠে-পড়ে লাগলেন শাহিদ। দারুণ খেললেন। পাক-ডিফেন্স তছনছ! অতিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তান একজন হাফকে নীচে নামিয়ে দিলেন, গোলকিপার বদলালেন। মহিন্দর হয়তো জিতিয়ে দিতেন দলকে। শেষমুহূর্তে-পাওয়া পেনাল্টি কর্নারে হিট নিতে যাচ্ছেন, খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন আম্পায়ার!

দু'দিন পরে ইসলামাবাদের টেস্টও ড্র হল ৩-৩। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল। আগের দুটো টেস্টের মতোই গোড়ার দিকে পাকিস্তান, দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয় দল বেশি ভাল খেলল। ন'মিনিটেই রশিদুল হাসানের ফ্রি-হিটে স্টিক ছুঁইয়ে গোল তুলে নিলেন ফরহাত। বিরতির পর, আট মিনিটে গোল শোধ। জোয়াকিম কার্ভালহোর স্কুপ ধরেই এগিয়ে আসা পাক-গোলকিপার মৈনুদ্দিনের পাশ দিয়ে বল নেটে প্লেস করলেন মার্সেলাস গোমস।

গোলের খোঁচা খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাসান সর্দার এবং তাঁর দল। পেনাল্টি কর্নার আদায় হল। কাশিম জিয়ার হিট গোলরক্ষক রাওয়াতের প্যাডে লেগে ছিটকে গেল। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের অবাক করে আম্পায়ারমশাই পেনাল্টি স্ট্রোক দিলেন! প্রতিবাদ করেও কাজ হল না। রাওয়াতের ডান দিক দিয়ে স্কুপ করে গোল করলেন আয়াজ মামুদ। ছাব্বিশ মিনিটের মাথায় পাকিস্তান 'ডি'র মধ্যে আক্রমণ তুলে আনল ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল শোধ করলেন জাফর ইকবাল। পরের মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকেই আবার গোল। মহিন্দরের তুমুল হিট মৈনুদ্দিনের প্যাডে লেগে পড়িমরি গোলে ঢুকল। খেলার শেষ মিনিটে ভিড়ের মধ্যে বিতর্কিত গোলে ম্যাচ ড্র করলেন পাকিস্তানিরা।

করাচি স্টেডিয়ামে শেষ টেস্টে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ২-১ গোলে জিতে দোসরা মার্চ, রবিবার সন্ধেবেলা ভারতীয় শিবিরে খুশির হাট বসল। শুরুতে হাসান সর্দারের দলের ছেলেরাই দারুণ খেলছিলেন। ন'মিনিটে দিনের সেরা গোল করলেন দলপতি স্বয়ং। পঁচিশ গজ লাইনের ঠিক বাইরে বল ধরে মহিন্দর ও কার্ভালহোকে টলিয়ে দিয়ে গোলের মুখে পৌঁছে, স্টিকের আলতো ছোঁয়ায় হাসান গোল তুলে নিলেন। চার মিনিট পর পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল শোধ করলেন মহিন্দর।

বিরতির পর, ন'মিনিটে জেতার গোল পেল ভারত। চার পাকিস্তানি ডিফেন্ডারকে স্টিক ও কোমরের মোচড়ে নাকাল করে শাহিদ যেই গোলের মুখে পৌঁছলেন, পিছন থেকে স্টিক দিয়ে শাহিদকে আটকালেন কাশিম। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে নিখুঁত পুশ—বাহারি গোল করলেন কার্ভালহো!

আটটা গোল করে সিরিজের সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন মহিন্দর পাল সিং।

হ্যাডলির কীর্তি

সুব্রত সিংহ

টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট পাওয়া এক বিরল ঘটনা। ১০৮ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন মাত্র ছ'জন। '৩০০ উইকেট সংগ্রহকারী ক্লাব'-এ সর্বশেষ যোগ দিলেন বিশ্বের তথা নিউজিল্যাণ্ডের চৌত্রিশ বছর বয়সী অসাধারণ অলরাউণ্ডার রিচার্ড হ্যাডলি। মাত্র কিছুদিন আগে দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ওয়েলিংটনের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের উইকেট পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হ্যাডলি এই কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। গত বছর (১৯৮৫) অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই তিনি এই গৌরব অর্জন করার কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছিলেন ওই সিরিজে ৩৩টি উইকেট দখল করে। সুখের কথা, দেশের মাটিতেই তিনি ওই কাজটি সম্পন্ন করলেন তাঁর ৬১তম টেস্টে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁর প্রয়োজন ছিল মাত্র একটি উইকেটের।

তিনশো উইকেট পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হ্যাডলি আরও একটি রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। এতদিন টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট ও ২০০০ রান সংগ্রহের রেকর্ড ছিল একমাত্র ইয়ান বথামের। এবার হ্যাডলিও এর ভাগিদার হলেন। এ ছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম তিনশো উইকেট সংগ্রহে হ্যাডলির স্থান আপাতত অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির ঠিক পরেই। লিলি এই গৌরব অর্জন করেছিলেন মাত্র ৫৬টি টেস্ট খেলেই।

হ্যাডলির অন্তর্ভুক্তিতে এই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা আপাতত দাঁড়াল ছয়-এ। তাঁর আগে যে পাঁচজন এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বোলারই তিনজন—ফ্রেড ট্রুম্যান, বব উইলিস ও ইয়ান বথাম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস্ ও অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি হলেন এই ক্লাবের বাকি দুই সদস্য। যেহেতু হ্যাডলির ব্যাপারটা একেবারেই টাটকা, তাই ওই পাঁচজনের ৩০০ উইকেট সংগ্রহের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করার আগে হ্যাডলির সাফল্য নিয়ে আলোচনা সেরে নেওয়া যাক্।

হ্যাডলি তাঁর টেস্ট-জীবন শুরু করেছিলেন '৭২-'৭৩ সিরিজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে। তাঁর টেস্ট-জীবনের প্রথম ও তিনশো উইকেট পাওয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা ওয়েলিংটনেই তিনি প্রথম টেস্ট-উইকেট পাওয়া শুরু করেছিলেন। আর এই একই টেস্ট-কেন্দ্রে তিনি পেলেন তাঁর তিনশো উইকেট।

'তিনশো উইকেট সংগ্রহকারী ক্লাব'-এর পত্তন ঘটিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকের দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড ট্রুম্যান। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫, চোদ্দ বছর দাপটে খেলে ৬৭টি টেস্টে ট্রুম্যানের সংগ্রহ ছিল ৩০৭টি উইকেট। তিনি ৩০০ উইকেট পূর্ণ করেছিলেন তাঁর ৬৫তম টেস্টে।

দীর্ঘ দশ বছর এই গৌরব আঁকড়ে থাকার পর এই ক্লাবে ট্রুম্যানের সঙ্গী হন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চৌকস অলরাউণ্ডার ল্যান্স গিবস্। ১৯৫৭-৫৮ সিরিজে ত্রিনিদাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম-টেস্ট-অভিষেক হয়েছিল ছিপ্‌ছিপে রোগা চেহারার এই ছেলেটির। ওই টেস্টে ওয়াকার হাসান তাঁর প্রথম টেস্ট-শিকার। এরপর তিনি তাঁর প্রায় চব্বিশ বছরের টেস্ট-জীবনে ৭৯টি টেস্ট খেলে সংগ্রহ করেছিলেন ৩০৯টি উইকেট। তিনি তাঁর শেষ টেস্টেই ভেস্তে দিয়েছিলেন ট্রুম্যানের ৩০৭ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড। তাঁর ৩০০ উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছিল ৭৫তম টেস্টে।

তিনশো উইকেট সংগ্রহের কাজটি যিনি সবচেয়ে দ্রুত সেরে ফেলেছিলেন তিনি হলেন সত্তরের দশকের সবচেয়ে সম্ভ্রম আদায়কারী ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি। মাত্র ৫৬টি টেস্টেই তিনি ওই অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন। আর এর থেকেই বোঝা যায় যে, ওই সময় তিনি তাঁর বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে কতটা সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে যাবার আগে ৭০টি টেস্ট খেলে তাঁর ঝুলিতে ভরে নিয়ে গেছেন ৩৫৫টি মূল্যবান উইকেট।

তবে তিনিও সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়ার রেকর্ড আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না। কেননা, বিশ্বের তথা ইংল্যাণ্ডের দক্ষ অলরাউণ্ডার ইয়ান বথাম প্রায় তাঁকে ধরে ফেললেন বলে।

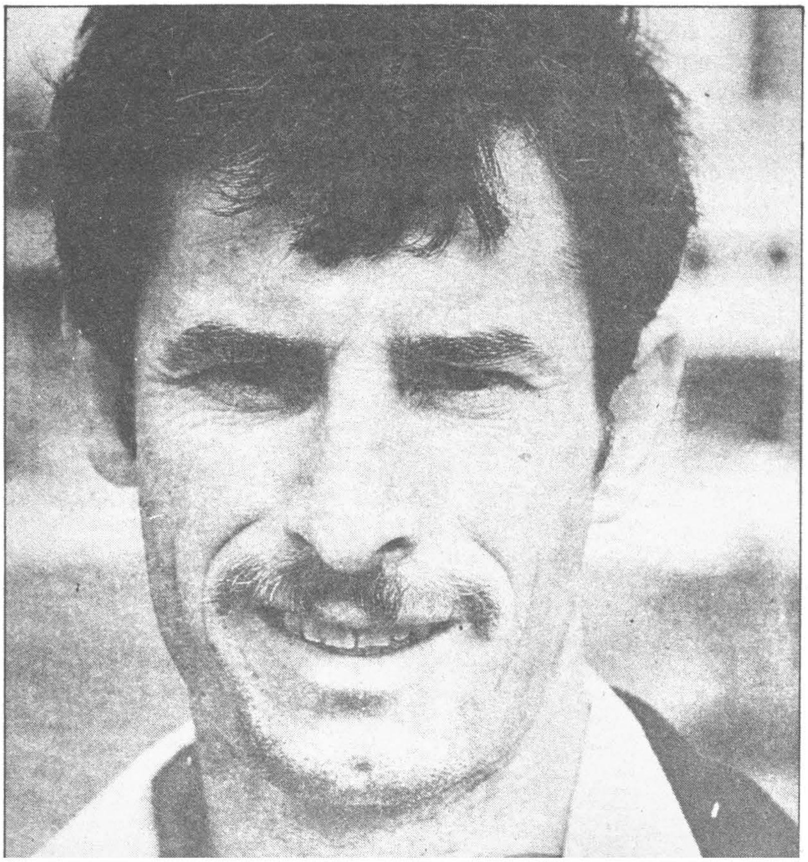

কলকাতায় আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

আগে ছোটবেলায় বাচ্চাদের শেখানো হত, 'তাস, দাবা, পাশা, তিন কর্মনাশা।' পাশা এখন বলতে গেলে প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু তাস আর দাবাখেলা কর্মনাশা নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দাবাখেলা এখন সকলের কাছেই খুব প্রিয়। ভারতে উদ্ভাবিত এই ঐতিহাসিক খেলাটির জনপ্রিয়তা ইণ্ডোর গেমসের মধ্যে যে অনন্য সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ ভারতে দেখা দিয়েছেন অনেক উদীয়মান দাবাড়ু। ভাল দাবাখেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্তমানে ভারতীয় দাবা ফেডারেশন যে কর্মসূচি হাতে তুলে নিয়েছেন তারই সার্থক রূপায়ণ দেখা গেল কয়েক দিন আগে, কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয় গোর্কিসদনে টাটা স্টিল ও অ্যালেখিন চেস ক্লাবের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক গ্র্যাণ্ডমাস্টার দাবা টুর্নামেন্ট। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩ রাউণ্ডের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী উৎসব। টানা এত দিনের প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়রা বিশ্রাম নিয়েছিলেন মাত্র একদিন, সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি।

এই প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের ১৪ জন নামী দাবাড়ু অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে সাতজন ছিলেন ভারতীয় এবং বাকি ৭ জন বিদেশী। ভারতের প্রতিনিধি বাংলার গর্ব বর্তমানে টাটায় চাকুরিজীবী ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার বা আই· এম· দিব্যেন্দু বড়ুয়া (রেটিং ২৩৯৫) ছিল প্রতিযোগিতার কনিষ্ঠতম দাবাড়ু, আই· এম· বিশ্বনাথন আনন্দ (রেটিং ২৪০৫) ছিলেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার হতে গেলে প্রয়োজনীয় দুটি নর্মের মধ্যে ১টির অধিকারী, আই· এম· প্রবীণ থিপসে (রেটিং ২৪৮৫), ছিলেন আই· এম· ভি· রবিকুমার (রেটিং ২৩৭০), অরুণ বৈদ্য (আই· এম· (রেটিং ২৩৪০)। আরও ছিলেন ডি· ভি· প্রসাদ (রেটিং ২৩৬০), যাঁর সামনে সুযোগ ছিল এই প্রতিযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হওয়ার। ছিলেন এ· মিচাইও (রেটিং ২৩২০), যিনি হলেন এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কম রেটিং-এর খেলোয়াড়। বিদেশের সাতজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলাদেশের আই· এম· নিয়াজ মুরশেদ (রেটিং ২৪০৫), তিনিও অধিকারী ছিলেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার হতে গেলে প্রয়োজনীয় দুটি নর্মের মধ্যে একটি। আমেরিকা থেকে এসেছিলেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার অ্যাণ্ডু সলটিস (রেটিং ২৪৪০), চেকোস্লোভাকিয়া থেকে এসেছিলেন ভি· ইয়ানসা (রেটিং ২৪৮৫), বুলগারিয়া থেকে এসেছিলেন ভি· ইনকিয়ভ (রেটিং ২৪৬৫)। রাশিয়া থেকে এসেছিলেন তিন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। এসেছিলেন জি· আগজামভ (রেটিং ২৫৪৫), যিনি ছিলেন এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বেশি রেটিং-এর খেলোয়াড়। এসেছিলেন ইউরি রাজুভায়েভ (রেটিং ২৫২৫), ভি· শেসকোভস্কি (রেটিং ২৪৫৫)।

এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হন নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে আগজামভই। তিনি পয়েন্ট পান ১০, পুরস্কার হিসেবে তিনি পান সুদৃশ্য রুসি মোদী ট্রফি ও ১৬ হাজার টাকা। দ্বিতীয় হন একজন বাঙালি, বাংলাদেশের নিয়াজ মুরশেদ ৯½ পয়েন্ট পেয়ে। এই প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় নর্মটি পান, কিন্তু গ্র্যাণ্ডমাস্টার হতে পারেন না প্রয়োজনীয় ২৪টি রাউণ্ডের (দুটি নর্ম মিলিয়ে) একটি কম খেলার ফলে আইনগত বাধার সুবাদে। তবে বিশেষজ্ঞদের মত যে, কিডের কাছে আবেদন করলে হয়তো তিনি গ্র্যাণ্ডমাস্টার হতে পারবেন এই দুটি নর্মের জন্যই। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন শেসকোভস্কি ও ভারতের ১৬ বছরের আনন্দ যুগ্মভাবে ৯ পয়েন্ট পেয়ে। আনন্দ এই প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম জি· এম· নর্ম থেকে বঞ্চিত হন মাত্র আধ পয়েন্টের জন্য। শেষ খেলায় তাঁকে রুখে বিমুখ করেন ভারতেরই প্রসাদ। নিয়াজ পুরস্কারের অর্থ হিসেবে ১২ হাজার টাকা এবং আনন্দ ও শেসকোভস্কি ৮ হাজার করে পান।

এই প্রতিযোগিতায় অনেকেরই আশা ছিল বাংলার দিব্যেন্দুর ওপর। কিন্তু শারীরিক ধকল সইতে না পেয়ে প্রথম দিকে অনেকগুলি ম্যাচ খারাপ খেলে ও হার স্বীকার করে আনন্দ, ইয়ানসা এবং নিয়াজের কাছে। পরের দিকে অবশ্য দিব্যেন্দু সামলে ওঠে এবং ৬ পয়েন্ট পেয়ে খেলা শেষ করে। শেষের দিকে সে শক্তিশালী তিন রুশি গ্র্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে ড্র করে ও মিতাই এবং বৈদ্যকে হারায়।

ভারতের প্রবীণ থিপসেও হতাশ করেন, মাত্র ৪½ পয়েন্ট পান এবং জি· এম· নর্ম থেকে বঞ্চিত হন।

তিন রুশি গ্র্যাণ্ডমাস্টার : (বাঁ দিক থেকে) আগজামভ, রাজুভায়েভ ও শেসকোভস্কি

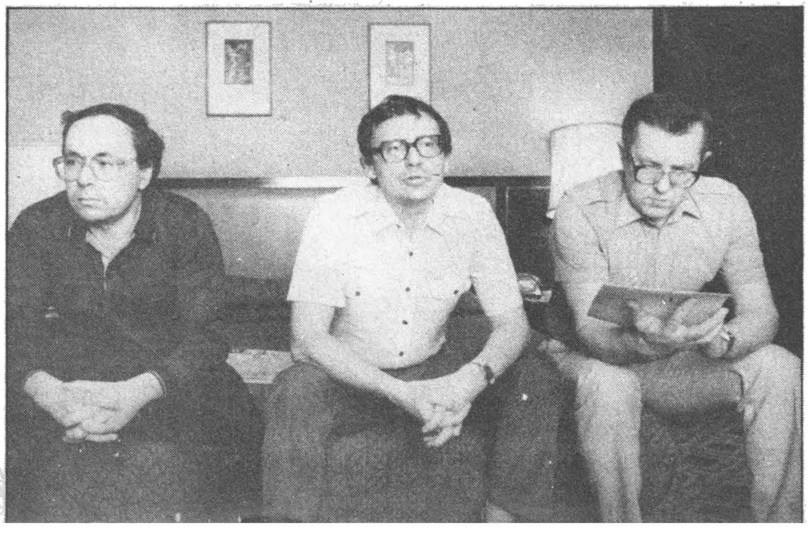

আন্তর্জাতিক রেফারি-বর্ষ

রত্না শূর

ফিফার শতবর্ষপূর্তি ও ত্রয়োদশ বিশ্বকাপ ছিয়াশি সালকে ফুটবলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বছরটিকে রেফারি-বর্ষ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। রেফারিদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন এতটাই অনুভূত যে, এই সিদ্ধান্তে কোনও মহল থেকে আপত্তি দেখা দেয়নি। প্রমাণিত হয়েছে, রেফারিদের ভূমিকা সম্পর্কে চেতনার টিমটিমে সল্‌তে উশ্‌কে দেবার সময় নির্বাচনে ফিফা কোনও ভুল করেনি।

কালো পোশাকের ব্যক্তিটি যে ফুটবল মাঠের সবচেয়ে সম্মাননীয় ব্যক্তি, এ-কথা দর্শক ও সমর্থকরা তো বটেই, খেলোয়াড়রাও আজকাল প্রায় ভুলতে বসেছেন। ফুটবল মাঠের বিচারপতির রায়কে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেবার মানসিকতা নতুনভাবে অর্জন করা বড় জরুরি। গত দু'দশক ধরে ফুটবল মাঠে ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনা, প্রাণহানি ও সংঘর্ষ এই শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট। জনৈক মেক্সিকান সমাজতত্ত্ববিদ লক্ষ করেছেন : "খেলা হল যুদ্ধের মতো। আক্রমণের প্রবৃত্তিকে উশ্‌কে দেয়।" দর্শকদের কাছে তাঁর অনুরোধ, "ওই বারুদটুকু বর্জন করুন।" ফুটবল দর্শকদের চিত্তের বারুদ বর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় হল, কালো পোশাকের ব্যক্তিটির ওপর আস্থা রাখা।

এই আস্থা সৃষ্টির যাবতীয় দায় কেবল দর্শকদের নয়। স্বয়ং রেফারিদেরও আস্থা অর্জনের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। গত দু'টি বিশ্বকাপে রেফারিদের ভূমিকা নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। বিতর্কের ঘোলা জল পরিষ্কার হবার পর যে সত্যটি স্বচ্ছ, তা হল পরিচালনা সন্তোষজনক ছিল না। বিশেষ করে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার মারাদোনা ও ব্রাজিলের জিকোর ওপর ইতালির ডিফেণ্ডার জেন্টিলের অনবরত অন্যায় আক্রমণ ও রেফারির নির্বিকার ভূমিকা দূরদর্শনের পর্দায় আমরাও দেখেছি। মেক্সিকো থেকে মরক্কো পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের ফরোয়ার্ডদের পায়েই ক্ষতের সংখ্যা বাড়ছে রেফারিদের চোখের সামনে। ফুটবলে যাঁরা সত্যিকারের শিল্পী, বর্বরতার হাত থেকে তাঁদের রক্ষার দায়িত্ব পালনে রেফারিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। জিকো প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ করেছেন। মোদ্দা কথা হল, সুষ্ঠুভাবে খেলার শেষ বাঁশি বাজানোই রেফারিদের শেষ কর্তব্য নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফুটবলকে আনন্দদায়ক শিল্প হিসেবে রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কেও রেফারিদের আরও সতর্ক হতে হবে।

স্পেন বিশ্বকাপে প্রযুক্ত বহু অন্যায় পদ্ধতির একটি

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে শিল্পকে হটিয়ে দিয়ে খেলার মাঠে রাজত্ব করবে বর্বরতা, শিল্পী-ফুটবলারদের জায়গায় নেতৃত্ব করবে পালোয়ান ফুটবলাররা, আনন্দদায়ক ফুটবল আতঙ্কদায়ক হয়ে উঠবে। কোন্ জমানাকে ফুটবল অনুরাগীরা স্বাগত জানাবেন, সে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত সময় এসে গেছে। ফিফার সিদ্ধান্তে তারই প্রতিফলন।

দায়িত্বশীল রেফারি, শ্রদ্ধাশীল খেলোয়াড় ও সচেতন দর্শকের সিম্ফনি ফুটবলকে শিল্প ও আনন্দের কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তা বহু বছর পরীক্ষিত হয়নি। রেফারি-বর্ষে মেক্সিকো বিশ্বকাপে, শুধু মেক্সিকো কেন, বিশ্বের সব ফুটবল মাঠেই, সেই নিরীক্ষা নতুনভাবে শুরু হোক। রেফারি-বর্ষ সার্থক হোক।

ক্রিকেটারদের গল্প

সম্রাট রায়

আম্পায়ারিং নিয়ে অসন্তোষ প্রায় সব ক্রিকেটারেরই আছে। এই ক'দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার আম্পায়ারদের কাণ্ডকারখানা দেখে সফরকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার বেঙ্কটরাঘবন আর ক্যাপ্টেন কপিলদেব তো রেগেই আগুন। সত্যি বলতে কী, মাঝে-মাঝে এক-একটা দেশের আম্পায়ারিংয়ের মান এমন নেমে যায় যে, সফরকারী দেশকে তার মর্মান্তিক ফল ভোগ করতে হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতকে ঠিক এইরকম জঘন্য আম্পায়ারিংয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। অকল্যাণ্ড টেস্টে ঘটেছিল একটা মজার ঘটনা। নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের কিছুতেই আর আউট দিচ্ছেন না

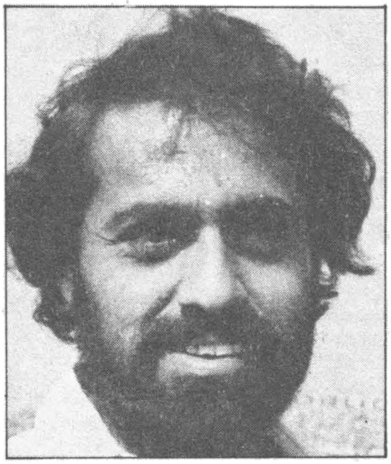

আম্পায়ার। ভারতের বোলার এবং ফিল্ডাররা আপিল করে-করে ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ। চন্দ্রশেখরের মতো অমন ঠাণ্ডা মেজাজের ক্রিকেটারও ভেতরে ভেতরে চটে লাল। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ব্যাটসম্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বোল্ড করলেন চন্দ্রশেখর। এবং সঙ্গে-সঙ্গে আম্পায়ারের দিকে ঘুরে আপিল করলেন, "হাউজ দ্যাট ?"

আম্পায়ার একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "এটা আর আপিল করছেন কেন! দেখতেই তো পাচ্ছেন ব্যাটসম্যান বোল্ড হয়েছেন!" ক্ষুব্ধ, হতাশ চন্দ্রশেখর বললেন, "ব্যাটসম্যান যে বোল্ড হয়েছেন সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনার কি মনে হয় ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন ?"

* * *

১৯৭০-৭১ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম সিরিজ জেতে। ওই সফরে ভারতের পক্ষে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত লড়াই করেছিলেন একনাথ সোলকার। দিলীপ সারদেশাই আর সোলকার প্রায় প্রত্যেক ম্যাচেই ভারতকে বাঁচিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দর্শকরা মোটাসোটা সারদেশাই আর রোগা-পাতলা সোলকারের নাম দিয়েছিল 'লরেল হার্ডি'। সোলকার খুব বড়মাপের ব্যাটসম্যান ছিলেন না। কিন্তু নিজস্ব

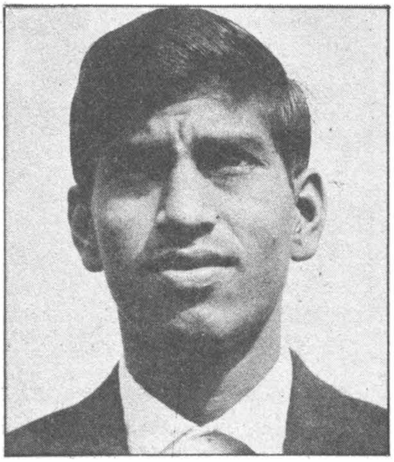

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মনের জোরে উইকেটে টিঁকে থাকতেন।

বার্বাডোজ টেস্টে ব্যাট করছেন সোলকার। নতুন বলে বেশ কয়েকবার 'বিট' হয়েও ভাগ্যক্রমে আউট হননি। একসময় যে-বলে খেলা হচ্ছিল, সেটার আকার নষ্ট হয়ে যায়। বল পালটে খেলা যখন আবার শুরু হবে, তখন সোলকার বললেন, "দেখি, নতুন বলটা কেমন ?"

বলটা ছিল গ্যারি সোবার্সের হাতে। সোলকারের দিকে তাকিয়ে গ্যারি বললেন, "বল দেখে তুমি কী করবে ? এতে তোমার কোনও লাভ নেই। তুমি খেলবে আর মিস করবে, টিঁকেও থাকবে।"

সবার সামনে বলায় সোলকারের একটু রাগ হয়। তবে উত্তর দেবার ব্যাপারে সোলকার কাউকে ছেড়ে কথা বলার লোক নন। গ্যারি সোবার্সের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে সোলকার বললেন, "এই যে, শুনুন, যেভাবে আপনি খেলেন, সেভাবে আপনি খেলুন। আমি যেভাবে খেলি, সেভাবে আমাকে খেলতে দিন।" স্যার গ্যারিকে এইভাবে কথা বলার সাহস দেখাতে খুব কম লোকই পেরেছেন।

* * *

১৯৭৪ ইংল্যাণ্ড সিরিজে এজবাস্টন টেস্টে প্রথম আম্পায়ারিং করতে নেমেছেন বিল অ্যালে। প্রথম দিনের প্রথম বলেই আউট হয়ে গেলেন ভারতের ওপেনার সুনীল গাওস্কর। আম্পায়ারের দিকে না তাকিয়েই প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন তিনি।

প্রথম দিনের খেলা শেষ হতেই

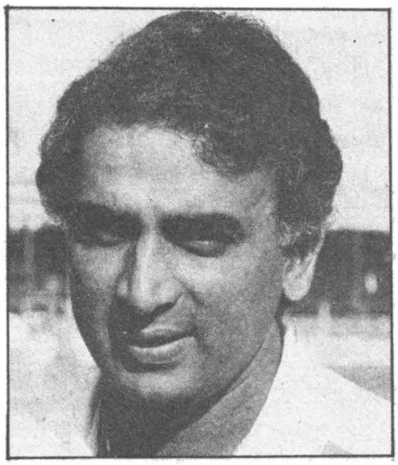

আম্পায়ার বিল অ্যালে দেখা করলেন গাওস্করের সঙ্গে, "আপনি বেশ লোক তো মশাই!" বিলের কথার ধরনে গাওস্কর তো রীতিমত অবাক। অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না কী করেছেন।

"বুঝতে পারলেন না ? আরে মশাই, আমার জীবনের প্রথম টেস্টে প্রথম বলে প্রথম সিদ্ধান্তটা জানাবার আগেই বেরিয়ে এলেন! আঙুলটা তোলারও একটা সুযোগ দিলেন না।"

তোমরা শুনলে অবাক হবে, ওই টেস্টের শেষ দিনের শেষ বলে ভারতের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের বিরুদ্ধে এল· বি· ডব্লু'র সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উনিই।

"আপনি কি আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসেন ? দাড়ান ! দাড়ান ! ভুল বুঝবেন না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেসার কুকার নিয়ে আর সেটা আপনার স্ত্রীর-ই সুরক্ষার জন্যে। যদি আপনার স্ত্রীকে অল্প ভালবাসেন, তাহলে যে কোন প্রেসার কুকার কিনে দিতে পারেন। যদি তার থেকে একটু বেশীই ভালবাসেন তাহলে আরও ভাল প্রেসার কুকার কিনে দিন। কিন্তু যদি আপনার প্রাণের থেকেও তিনি প্রিয় হন, তাহলে নিশ্চই প্রেস্টীজ প্রেসার কুকার কিনে দিতে হবে।

এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রেস্টীজই বা কেন ?

এইজন্য যে গাস্কেট রিলীজ সিস্টেম নতুন প্রেস্টীজকে ১০০% নিরাপদ করেছে। এই অভিনব গাঃ রিঃ সিঃ কিভাবে কাজ করে দেখুন।

যদি খাবার জমে ওয়েট – ভালভের মুখ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ প্রেসার কুকারে স্বাভাবিকের বেশী প্রেসার তৈরী হয়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু নতুন প্রেস্টীজে যদি সেফটি-ভালভ ও অকেজো হয়ে যায়, তাহলেও ভেতরের অতিরিক্ত ভাঁপ গাঃ রিঃ সিঃ দ্বারা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আপনি সম্পূণ সুরক্ষিত। সেজন্য নতুন প্রেস্টীজকে নিয়ে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই।"

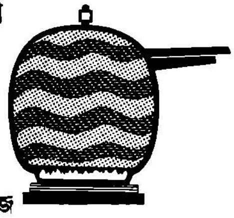

যদি বৌকে সত্যিই ভালবাস
তাহলে প্রেস্টীজই নিয়ে এস

প্রেস্টীজ

Prestige 25 SILVER JUBILEE 1984-85

ttk উৎপাদন

শুধুমাত্র প্রেস্টীজই ১০০% নিরাপদ। একমাত্র প্রেস্টীজেই আছে গাঃরিঃসিঃ।

MAA (S) TTP 3D BEN 85

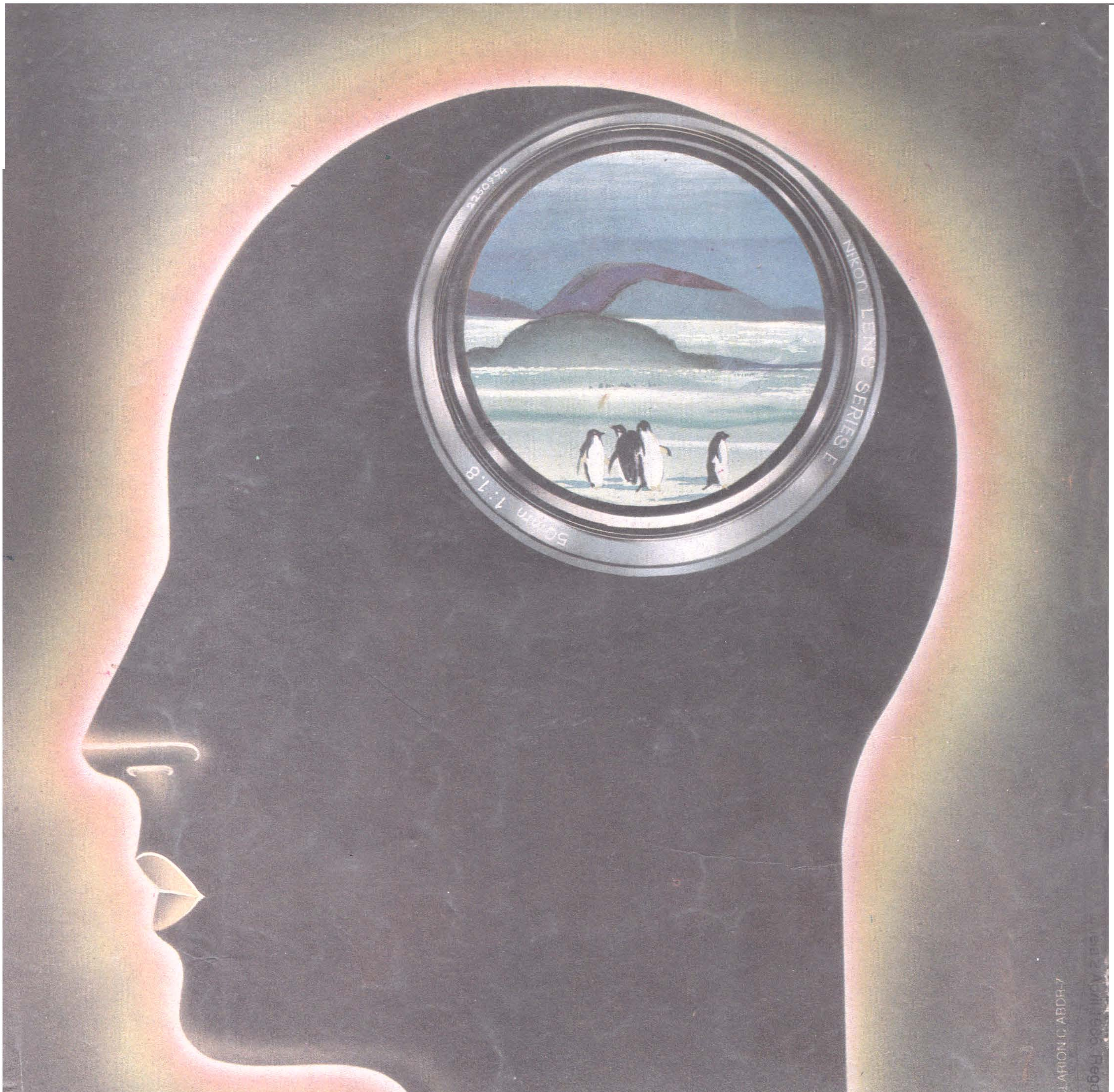

ভ্রমণ পিপাসুদের মনের তৃষ্ণা মেটায়

সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ের পক্ষে কি সুদূর বরফের দেশ আন্টার্কটিকায় পাড়ি দেওয়া সম্ভব ? নাইজেরিয়ার রাজধানী লেগোসে ভারতীয়দের জীবন রোমাঞ্চকর না ভয়ঙ্কর ? ইতিহাস ও আধুনিকতার সমন্বয় রোমের আসল সত্য কি ? সেকি ফেলিনির 'লা দল্চে ভিতা' ? পোপের ভ্যাটিকান ? না নাইট ক্লাবের পিছল পথ ? এই দেশ, এই পৃথিবীর হাজারও রকম অভিজ্ঞতার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যাবে 'দেশ'-এর 'ভ্রমণ' বিভাগে ।

'দেশ'-এর অবশ্য আরও নানান অঙ্গ আছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, খেলাধূলা, শিল্পকলা, সাক্ষাৎকার—যে কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন 'দেশ'-এক পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা ।

আর আজ বিশেষ করে 'দেশ'-এর প্রতিটি সংখ্যায় রয়েছে এক নতুন প্রতিশ্রুতি । এর প্রচ্ছদপটে সমসাময়িক কালের যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সার্থক প্রতিফলন । এর অঙ্গসজ্জায় এবং মুদ্রণে রয়েছে ঔজ্জ্বল্য ও সমকালীনতার চিহ্ন ।

বাস্তবিকই, মনের জানালা খুলে দেওয়ার মত পত্রিকা একটিই । 'দেশ' ।

দেশ

চিন্তার জগতে বাঙলার ও বাঙালীর গৌরব

CLARION C ABDR-7

Regd. No. WB/CC … South 683TN/MSIC